আবার আসবেন তিনি

বুলবুল আজাদ

আবার আসবেন তিনি

অবার আসবেন তিনি

বুলবুল আজাদ

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

Aevi Avm‡eb wZwb
ejej AvRv`

cKvkKvj
6ô ms¯‹iY
†m‡Þ¤i 2009 mvj

cKvkK
nwKgvev` LvbKv‡q †gvRv‡Ïw`qv
fBMo, bvivqYMÄ
†hvMv‡hvM 01726288280, 01190747407

c"Q`
Ae`i †ivDd miKvi

g`K
kIKZ wcÈvm
190/we, dwK‡iicj,XvKv-1000
†gvevBj 01711-264887
01715-302731

wewbgq
cÂvk UvKv

ABAR ASBEN TINI : A life sketch of Hazrat Eesa (As.) Written by Bulbul Azad and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Printed by Shawkat Printers, 190/B Fakirapool, Dhaka-1000, Cover Designer Abdur Rouf Sarker

Exchange Tk. 50/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0041-5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মনে নেই, কোথায় ছিলাম আমরা। কোথায় শুনেছিলাম সত্যের প্রথম পাঠ, প্রথম প্রশ্ন— আমিই কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই? কোথায় পেয়েছিলাম আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট অস্তিত্বের প্রথম আস্বাদ। বিনা প্রার্থনায়। বিনা যাঞ্চায়। সেই বিস্মৃত বিমোহনের জ্যোতির্ময় সূচনার সঙ্গে কারা করে দিলেন চেতনার সংযোগ?

জানিনা, কোথায় চলেছি। এই জটিল, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের শোকাকুল সমাপ্তি— মৃত্যু। তারপর? কি আছে সেখানে? কোন কাননের কনক-কুসুম। কোন অনলের লেলিহান নিয়তি। ওই অবশ্যম্ভাবী বিভক্তির সংবাদ নিয়ে এলেন কারা? কোন মানুষেরা?

আমরা অবশ্যই আদিসম্ভূত। কিন্তু অন্তহীন। যে ঘাট থেকে নোঙর তুলেছে নিরুপায় নৌকা— সে ঘাটে আর ফেরা যাবে না কিছুতেই। শুধু যাত্রা। শুধুই সম্মুখযাত্রা। পৃথিবীস্পৃষ্ট এই জীবনের অতীত হয়ে উঠেছে ভারী। বর্তমান কেবলই অনুমান। যাত্রা শুধুই অন্ধকার আগামীর দিকে। নিরুপায় অনিশ্চিতির দিকে। কোন সম্ভার সংগ্রহ করতে হবে এখান থেকে? কোন বাক্য? কোন কর্ম? কোন প্রজ্ঞা? কোন প্রেম— কারা জানালেন এ সমস্ত অভিজ্ঞান? বুদ্ধির অহমিকা আর অপরিস্রুত ভাবাবেগ বার বার ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে মানবতাকে ওই সকল আলোকিত প্রত্যাদেশবাহী প্রেরিত পুরুষদের পথ থেকে যাঁরা ছিলেন প্রকৃত মানুষ। আল্লাহ্তায়ালার নির্বাচিত নবী এবং রসূল। তাঁরা বিশ্বাসের মৃত্তিকায় চাষ করেন পরিশোধিত বুদ্ধির। অপআবেগমুক্ত প্রেমের। প্রেম-প্রজ্ঞা মিশ্রিত সম্পন্ন বৃক্ষের। প্রেমের ফুল। প্রজ্ঞার ফল।

ওই সকল মানুষদের পথের অনুসারী হবার জন্যই বার বার উচ্চারণ আমাদের, তাঁদের পথ যাঁরা তোমার একান্ত অনুগৃহীত। প্রকৃত কৃপাপরবশ আল্লাহ্তায়ালা

নিযুক্তি দিয়েছেন তাঁদেরকেই তাঁর বাণীবাহক হিসাবে, পথ প্রদর্শকরূপে, অপপথপীড়িত মানুষের। অতএব সুপরিণামাকাঙ্খী মানুষের কি একান্ত কর্তব্যকর্ম নয়, তাঁদেরকে মান্য করা। সকল অনাচার, অকল্যাণের বিরুদ্ধে নিরন্তর উড্ডীন তাঁদের পতাকাতলে আশ্রয়াকাঙ্খী হওয়া? ওই অক্ষয় পথের প্রধান যাঁরা, তাঁদেরই একজন হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম। পবিত্রা মায়ের পবিত্র পুত্র তিনি। অলৌকিক তাঁর জন্ম-আবির্ভাব। বিদ্বেষী ও বুদ্ধিবাদী ইহুদীরা এবং অতিআবেগতাড়িত খ্রিস্টান সম্প্রদায়— দুই দলই তাঁর প্রতি মিথ্যাঅপবাদ আরোপকারী। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় রসূল হজরত ঈসা আ. এর প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহ্তায়ালাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন শেষ প্রত্যাদিষ্ট কিতাব কুরআন মজিদে— তাঁরই প্রিয় হাবীব হজরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ স. এর মাধ্যমে।

আল্লাহ্র প্রিয় রসূল হজরত ঈসা আ. এর পবিত্র জীবনকথা প্রকৃতরূপে পেশ করবার জন্যই **'আবার আসবেন তিনি'** রচনার চেষ্টা। আল্লাহ্তায়ালা গ্রন্থকার-প্রকাশক-পাঠক সবাইকে এই নূরানী নবীর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে সফল করুন। আমিন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

“যা তাদের জ্ঞানের আওতাবহির্ভূত ছিলো
আর যার পরিণতিও তাদের সামনে
সমুদ্ভাসিত হয়নি, তারা শুধু জল্পনা করে তা
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।” –সুরা ইউনুস–৩৯

Avgv‡`i cKwkZ eB

Zvdmx‡i gvhnvix (1Ñ12) †gvU 12 LÊ
gv`v‡iRb beIqvZ (1-8) †gvU 8 LÊ
gvKvgv‡Z gvhnvix
gKwkdv‡Z Avqwbqv • gvAvÔwi‡d jv`wbqv
gve`v Iqv gvÔAv`

gKZev‡Z gvmgxqv (1-3) †gvU 3 LÊ
bKkv‡q bKke›` • †Piv‡M wPkZx • evqvbj evKx
Rxjvb m‡hi nvZQwb • b‡i †miwn›` • Kwjqv‡ii KZe • c_g cwievi
gnv‡cwgK gmv • Zwg‡Zv †gv‡k` gnvb • bexb»`bx

Avevi Avm‡eb wZwb
m»`i BwZeË • †dviv‡Zi Zxi • gnv cve‡bi Kwnbx
Kx n‡qwQ‡jv Aeva¨‡`i

THE PATH
c_ cwiwPwZ • bvgv‡Ri wbqg • igRvb gvm • Bmjvgx wekvm
BASICS IN ISLAM • gvjveÏv wgbû

†mvbvi wkKj
wekv‡mi ewówPý • mxgvšcnix me m‡i hvI
ZwIZ wZw_i AwZw_ • †f‡O c‡o evZv‡mi wmwo
bx‡o Zvi bxj †XD • axi mi wej¤Z e¨_v

ধূসর প্রান্তর, একটি ঈষৎ হেলানো খেজুর গাছ এবং.....

চারপাশে মরীচিকার মোহন খেলা.....

চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পা আড়ষ্ট। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ-মন। আর হাঁটতে পারছেন না তিনি। তপ্ত মৃত্তিকা। দু'পা ছুঁয়ে হলুদ ঘাসের জটলা এবং খুব নিকট সান্নিধ্যে ঈষৎ হেলানো একটি শুষ্ক খেজুর গাছ।

তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ়া। প্রায়ই চলৎশক্তিরহিত। অথচ তিনি জানেন না আর কতদূর হাঁটতে হবে? আর যে পারছেন না। লালচে বালুভূমিতে সহসা ঘূর্ণি হাওয়া রচিত হয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যাচ্ছিলো। তাই দেখতে দেখতে অকস্মাৎ প্রসব-যাতনায় কঁকিয়ে উঠলেন মরিয়ম.....

পেছনে স্তেপ ভূমির নির্জনতা।

কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে বাবলা জাতীয় বৃক্ষ। এইকি বাইতুল লাহাম? জনহীন, পানিহীন বিরান ধূসর প্রান্তরে কেউ নেই। এই বিপন্ন সময়ে পাশে কেউই নেই। খেজুর গাছটি ঘেঁষে মৃত্তিকায় বসে পড়লেন মরিয়ম। কাঁদতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু না, কোত্থেকে যেনো মনে অভয় এসে বাসা বাঁধলো। মনে হলো– এই যে তিনি একাকী এখানে, নিঃসঙ্গ তাড়িত, অথচ তিনি একা নন। মনে হলো তার চারপাশ ঘিরে যেনো একটা সুবিশাল স্নেহময় প্রচ্ছায়া বিস্তৃত হয়ে সুনিবিড় সুখ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় অদ্ভূত ভালোলাগা একটা অনুভূতি– এই তীব্র যাতনার মধ্যেও.....

বহু দূরে–ধূসর একটা পাথুরে পাহাড় যেনো আকাশের গায়ে গেঁথে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তৃষ্ণার্ত বিবাগী মেঘ। তিনিও তো তৃষ্ণার্ত। কিন্তু তার চেয়েও জন্ম-যাতনায় তিনি এখন বেশী কাতর.....

দু'চোখ বুঁজে আসে হজরত মরিয়মের– আবার চোখ মেললেন, দেখলেন– খেজুর বৃক্ষের শাখায় একটি সোনালী গিরগিটি ঘাড় ফুলিয়ে রক্তচক্ষু মেলে তাঁকে দেখছে। গিরগিটিটি কি সত্যি রক্ত শোষণ করছে? নাকি উপহাস করছে?...

হায়রে! আমি যদি মরে যেতাম। আমার নাম-নিশানা যদি মুছে যেতো। তাহলে পৃথিবী থেকে 'কুমারী মাতা' এই অপবাদ, নিন্দা, এই কলঙ্কিত দুর্মদ জীবন বহন করতে হতো না। কী হবে শেষ পরিণতি আমার? কী হবে অনাগত শিশুটির ভবিতব্য? কোন্ পরিচয়ে শিশুটি বেড়ে উঠবে? কিংবা আমি....? এমনিতর নানান জটিল প্রশ্নবাণে নিজ মনে তখনো বিদ্ধ হচ্ছেন মরিয়ম। কিন্তু একসময় ভাবনা স্তিমিত হয়ে আসে। শরীরে দীর্ঘ অবসন্নতা নেমে আসে এবং খুব দ্রুত। পদযুগলে সফরের ধূলা মাটি, দেহে শান্ত শ্রান্তি....অবসন্নতা মুছে ফেলার মত নেহাৎ জাগতিক ক্রিয়া কলাপের সাথে তিনি তখন অচঞ্চল, অদ্ভূত উদাসীন.....।

বরকতময় শিশু ও অলৌকিক জ্যোতির্ময় পুরুষ

এই মুহূর্তে তিনি কি স্বপ্নতাড়িত কেউ?

মুখখানা বেদনাসিক্ত অথচ শুভ্র স্নাত মায়াবী মোহন মুখাবয়ব। দু'চোখ তখনো মুদ্রিত। মুহূর্তকাল আগে স্বজ্ঞানে ফিরেছেন মরিয়ম।

ধীরে ধীরে চোখ মেলছেন সদ্য ফোটা গোলাপ কুঁড়ির মতো। নাড়ীছেঁড়া সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানটিকে তিনি তখনো দেখেননি। মরিয়ম ভাবলেন, এই দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ জীবনের মানেও আছে। অদৃষ্টকে কেউ দেখতে পায় না, তবু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগফলই তো জীবন। এই জীবনকে যুদ্ধ মেনে নিয়েই বাঁচতে হবে। জীবনকে অর্থবহ করতে হবে। জাগতিক এই জীবনের সীমারেখার মধ্যে কোন নিগূঢ় দিকনিদর্শনা থাকলেও থাকতে পারে। জীবন মানেই যখন যুদ্ধ; তখন এই জীবন ধারণ করা যুদ্ধজয় বৈকি!

অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়। এই প্রত্যয় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ম আকস্মিক শুনতে পেলেন অলৌকিক কণ্ঠস্বরঃ মরিয়ম! ভয় করো না.... তোমার শিশু সন্তানকে এখন দেখো, চক্ষুকে শীতল করো .... আর নিম্নভূমিতে একটা নহর প্রবাহিত হচ্ছে .... এবং ঐ যে খেজুর গাছ; তার গোড়া ধরে নাড়া দাও– তাজা তাজা সুপক্ক খেজুর পড়বে .... তুমি পানাহার করো ... তৃপ্ত হও ....। –মরিয়ম চমকিত। অভিভূত। অদূরে প্রবহমান নহরটি দেখতে পেলেন তিনি। দেখলেন, শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের সুপক্ক নয়নাভিরাম খেজুরের কাঁদি, যা ইতোপূর্বে সেখানে ছিলো না।

.... হে মরিয়ম শোন! অলৌকিক পুরুষের উদাত্ত কণ্ঠ.... এসময়ে যদি কোনো মানুষকে কাছে দেখতে পাও– তাহলে ইশারায় তাকে জানাবে– আমি আল্লাহ্তায়ালার জন্যে রোজা মানত করেছি, আমি আজ কারো সাথে কথা বলবো না..... আরো কিছু উপদেশ বাণী উচ্চারণ করে জ্যোতির্ময় পুরুষটি অন্তর্হিত হলেন।

মরিয়ম একের পর এক বিস্ময়াবিদ্ধ। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সদ্যপ্রসূত আপন শিশুটিকে তিনি দেখলেন। যতই দেখছেন ততই মুগ্ধ হচ্ছেন। সত্যিইতো দু'চোখ সুশীতল হয়ে যাচ্ছে.....

বহু দূরে পর্বত শৃঙ্গ।

প্রান্তরের মধ্যপথে স্বর্ণ ঈগলের ডানার ছায়া ওড়ে.....। মরিয়ম আনন্দ-বেদনায় তখন উদ্বেলিত।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নয় মাইল দূরবর্তী এই স্থানটি বর্তমানে 'বেথেলহাম'।

দূরে সারাত পর্বতের টিলা। নিষ্প্রাণ মরুপর্বতটির মাথার উপর তরল ধাতুর মতো ঝলসানো আকাশ। ইতোমধ্যে মনের আগুনে ঝলসেছে তাঁর দেহ-মন। ক্ষুৎ-পিপাসায় তখন দারুণ কাতর তিনি। অলৌকিক জ্যোতির্ময় পুরুষটির কথিত পন্থায় তিনি খেজুর গাছটির গোড়া ধরে নাড়া দিলেন। কি অবাক কাণ্ড। তাজা তাজা সুপক্ক লোভনীয় খেজুর পতিত হলো মৃত্তিকায়। তিনি কুড়িয়ে এনে এক সময়ে খেজুর খেলেন। সুপেয় অপূর্ব স্বাদের অলৌকিক নহরের পানি পান করলেন। পানাহার করে অভূতপূর্ব তৃপ্তিবোধ করলেন মরিয়ম।

শিশুকে স্বীয় স্তনের দুগ্ধ পানও করালেন মরিয়ম। কিন্তু মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে যান তিনি। স্বজন, প্রিয়জন, দুর্মুখ প্রতিবেশীদের মুখগুলো হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মাথা থেকে তখন দংশিত স্মৃতিগুলি তাড়িয়ে দিতে পারেন না মরিয়ম। হিংসুকদের বিষ-জিহ্বায় যে অঢেল গরল মিশে আছে। কীভাবে মোকাবেলা করবেন তিনি। নিজের ভেতরে যেনো শুনতে পেলেন আরেকজনের আর্ত কণ্ঠস্বরঃ কে যেনো কাতর স্বরে বলছে ..... দয়া করো– দয়া করো হে মালিক .....

এখনই কি ফেরার পালা?

ব্যথাবিদ্ধ, শ্লথ দেহ। মরিয়ম তখনো দ্বন্দ্বিত। দ্রুততর হচ্ছে হৃৎস্পন্দন। হয়তো আবেগ তাড়িতও হয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু না, অলৌকিক নির্দেশ এলো ঐ মুহূর্তে ..... হে মরিয়ম! তোমার তো এবার ফেরার পালা ..... যখন তুমি তোমার জাতির কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করবে তোমাকে ঐ বরকতময় শিশু সম্পর্কে.... তাদেরকে তুমি ইশারায় জানিয়ে দেবে, –আমি আল্লাহ্র জন্যে রোজা রেখেছি, –তোমাদের যা কিছু প্রশ্ন করার, –এই শিশুটিকে প্রশ্ন করো ....। সেই অলৌকিক বার্তা বাহকেরই কণ্ঠস্বর। মরিয়ম চকিতে আশান্বিত হলেন। মেঘ-ম্লান হতাশা উড়ে গেল ঊর্ধ্ব আকাশ ফুঁড়ে।

স্বপ্নভঙ্গের ক্লান্তি নামতে না নামতেই শীতল দু'চোখে জেগে উঠলো অতিন্দ্রীয় আরেক স্বপ্ন। পরম যতনে বুকে আঁকড়ে ধরলেন আপন আত্মজকে। বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে ধীর পদক্ষেপে পা বাড়ালেন মরিয়ম।

কুদরতী শিশুর সাক্ষ্য প্রদান

সত্যি কি তাঁর নিজ শহরের মানুষ নিষ্ঠুরতা দেখাবে? মরিয়ম হেঁটে চলেছেন। আলু থালু যত্নহীন রুক্ষকেশ, মলিন পরিধেয়, মনে অনেক কথামালা।

মাথার উপর ধূসর-দগ্ধ আকাশ। তারই মাঝে উড়াল দেয়া সফেদ মেঘদল। মৃত্তিকায় তারই দৃশ্যমান ছায়া-স্রোত যেনো ভেসে চলেছে।

চলার পথে ডান পাশে বিশাল বালুকারাশি। আরো অনেকটা এগিয়ে খেজুরবীথির সারি। ঐতো মরু উপত্যকার উপরে একটি কুয়া। কুয়াটার চারপাশ ঘিরে জটলা করছে বেদুঈন পশুপালকেরা। ঐ কুয়াটাকে লক্ষ্য করে চারণরত কতিপয় মেষ ও উট ছুটে চলেছে হয়তো তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। এ জন্যে কি পানির আরেক নাম জীবন? এ রকম কুয়া আরো দেখতে পাওয়া যাবে নিঃঝুম পল্লীতে পল্লীতে। কুয়ার উপরে কাঠের চাকাগুলি ঘুরছে এবং ঘুর্ণায়মান চাকার সংগীতময় শব্দ শুনতে শুনতে মরিয়ম অভিব্যক্তিহীন হাঁটছেন। বুকে আঁকড়ে ধরা আপন শিশু।

নিজ শহরে পা রেখেই মনের সুপ্ত শংকা আচানক লাফিয়ে জেগে উঠলো।

কিন্তু একি! তাঁর আশংকা তো মিথ্যে নয়। চারপাশে সকৌতুক, নোংড়া কুৎসিত দৃষ্টি তাঁকে বিদ্ধ করছে। নিন্দুকেরা তারিয়ে তারিয়ে যেন পরিস্থিতিটা লেহন করছে।

শিশুপুত্রসহ হজরত মরিয়মকে দেখে স্বজন, কুজন, প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী–মাতোয়ারা। বিস্ময়ে হতবাক। কেউ কেউ হৈ চৈ শুরু করে দিলো। কেউ কেউ শিশু-মাতাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে ঘিরে ধরলো, –হায় মরিয়ম! একি দেখছি...?

হজরত মরিয়ম জবাবহীন। নির্বাক।

একজন পড়শী বললো, হে হারুনের বোন। তুমি তো সৎ পিতার কন্যা, তোমার মাতাও চরিত্রহীনা ছিলেন না; কিন্তু তুমি একি করলে.....?

হজরত মরিয়ম তখনও কথাহীন। তিনি পলকহীন চোখে বরকতময় শিশুটির দিকে দৃষ্টিপাত নিবদ্ধ রেখেই ইশারায় কিছু বক্তব্য জানালেন; অর্থাৎ তোমাদের যা কিছু প্রশ্ন, –এই শিশুটিকে করো– আমি রোজা রেখেছি....

বনী ইসরাইলদের মধ্যে রোজা অবস্থায় কথা না বলা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

দুগ্ধপোষ্য দু'একদিনের মাত্র শিশু; এই শিশু তাদের জিজ্ঞাসাবাদের কি জবাবদিহি করবে? এ যে অবিশ্বাস্য অবাস্তব কথা! লোকেরা বললো, মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার মরিয়ম? এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো আমরা? কি বলতে চাও তুমি? কি বলতে পারে অবোধ এই শিশু? এবং তারপর একি অদ্ভূত কাণ্ড। সমবেত মহল্লাবাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

শিশুটি তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলে উঠলেনঃ শুনুন, হে লোকসকল! আমি আল্লাহ্‌র এক বান্দা। আল্লাহ্ আমাকে কিতাব প্রদান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আমাকে বরকতময় ও প্রাচুর্যময় বানিয়েছেন তিনি এবং সালাত ও যাকাত আদায় করতে বলেছেন, যদ্দিন আমি বেঁচে থাকবো। তিনি তো আমাকে স্বীয় মাতার হক আদায়কারী বানিয়েছেন। আল্লাহ্ আত্ম-অহংকারী, নিকৃষ্ট এবং নাফরমান বানাননি আমাকে.... অবিশ্বাস্য, অশ্রুতপূর্ব শিশুর এই অলৌকিক বাচনে উপস্থিত জনতা 'থ' বনে গেলো। যে শিশু সদ্যপ্রসূত প্রায় অপগোণ্ড, তাঁর মুখেই এই জ্ঞানগর্ভ ভাষণ? এ যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

বরকতময় শিশুটি তখনো নিজ জন্মরহস্য, নিজ মাতার পবিত্রতা সম্বন্ধে বিস্ময়কর এবং সত্যনিষ্ঠ সাক্ষ্য প্রদান করেই চলেছেন.....

উপস্থিত কারো কারো মধ্যে প্রতীতী জন্মালো, হলেও হতে পারে। এটিতো আল্লাহ্‌তায়ালারই একটি সত্য নিদর্শন। তাহলে মরিয়মকে অপবিত্র, দুঃশ্চরিত্র বলা কেন? কিন্তু প্রতীতী ফিরে এলো না সেই অবিশ্বাসী দলের। সন্তুষ্ট হলো না তারা।

অহংবোধে, হিংসাবিদ্বেষে এবং পরশ্রীকাতরতায় তারা দগ্ধ হতে থাকলো নিরন্তর। নিশিদিন।

পূর্বকথা

সন্তান প্রসবের কিয়ৎকাল পরেই হান্না জানতে পারলেন, তিনি এখন একটি কন্যা সন্তানের জননী। হান্না ছিলেন হজরত মরিয়মের মাতা।

পিতা ইমরান ইবনে নাশী; মাতা হান্না বিনতে ফাকুদ ছিলেন হজরত যাকারিয়া আ. এর বংশের অতীব মর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহ্ ভক্ত ব্যক্তিত্ব।

হজরত যাকারিয়া আ. ছিলেন ইসমাইল বংশীয় একজন বিশিষ্ট নবী– (ইবনে কাসীর)।

বশীর ইবনে ইসহল তাঁর আলমুবতাদী গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত যাকারিয়া আ. এর পত্নী আল ইয়াশা এবং হজরত মরিয়মের মাতা হান্না উভয়ে ছিলেন পরস্পর সহোদরা বোন। ফলতঃ হজরত যাকারিয়া ছিলেন হজরত মরিয়মের খালুজান।

ইমরান ইবনে নাশীর আল্লাহ্ ভীরুতার কারণে তিনি বাইতুল মোকাদ্দাসের (মসজিদে আকসার) ইমামতি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। (কাসাসুল কুরআন)।

একটি পুত্র সন্তানের তীব্র আকাঙ্খা স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ছিলো। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন এজন্যে তাঁরা। কিন্তু আশা পূর্ণ হলো না। বয়েস হেলে পড়েছে। বার্ধক্যে উপনীত, অথচ ক্রন্দন, ফরিয়াদ– থেমে নেই।

ইমরান ও হান্না উভয়ে একটি নিয়তে স্থির ছিলেন যে, তাদের একটি সন্তান হলে, এই সন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেম নিযুক্ত করবেন।

অবশেষে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন মহান আল্লাহ্তায়ারা। স্ত্রী হান্না গর্ভবতী হলেন। কি আনন্দ! শোকরগুজার বান্দা-বান্দী অবনত হলেন মহান স্রষ্টার প্রতি। ইবাদতে অধিক মশগুল হলেন।

'যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি মান্নত করিয়াছি– আপনার জন্য এই সন্তান, যাহা আমার গর্ভে রহিয়াছে তাহাকে মুক্ত রাখা হইবে, সুতরাং আপনি আমার থেকে গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'

'অনন্তর সে যখন কন্যা সন্তান প্রসব করিল, বলিতে লাগিল– হে আমার পালনকর্তা! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি।..... আর আমি এই কন্যার নাম রাখিলাম 'মরইয়ম' এবং আমি তাহাকে ও তাহার সন্তানদেরকে আপনার নিকট সমর্পণ করিতেছি.....।' (আলে ইমরান)

একটি কন্যা সন্তান কীভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেমা হবেন? কীভাবে তাঁর মান্নাত পরিপূর্ণ হবে? এরকম একটা দুর্ভাবনা বিবি হান্নার মনের মধ্যে তুমুল ঝড় তুললো এবং সেটি ছিলো হান্নার তাৎক্ষণিক দুর্ভাবনা মাত্র।

তখনই প্রত্যাদেশ এলো, 'হে হান্না! আমি তোমার এই কন্যা সন্তানকেই কবুল করে নিলাম.....'

বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবায় স্বীয় সন্তানদেরকে ওয়াকফ করা তৎকালীন ইসরাইলীদের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় রেওয়াজ ছিলো। এই কাজকে তারা পবিত্রতম ইবাদত মনে করতো। (বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড)

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, জমহুরের অভিমত হচ্ছে– আইশাআ, মরিয়মের সহোদরা ছিলেন: কিন্তু পবিত্র কুরআনে যে ভঙ্গিতে হজরত মরিয়মের জন্ম-বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হয়েছে; সে ক্ষেত্রে জমহুরের অভিমত নাকচ হয়ে যায়। বিশিষ্ট হাদীস বেত্তাদেরও মতে আইশাআ ছিলেন বিবি হান্নার সহোদরা হজরত মরিয়মের খালা।

যেহেতু হজরত যাকারিয়া আ. ছিলেন পবিত্র হায়কালের সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহর নবী, তিনি মরিয়মের দেখাশোনা, তত্ত্বাবধানের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু অন্যান্যরাও এই আগ্রহ দেখালো। ফলে জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি হলো। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবার আশংকা দেখা দিলো। তাহলে কীভাবে এর ফয়সালা হবে?

সিদ্ধান্ত হলো, লটারীর মাধ্যমেই এই দাবীর সপক্ষে রায় প্রদান করা হবে।

ইসরাইলী ইতিহাসবৃত্তান্তে জানা যায় এই লটারী তিনবার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং প্রতিবারই হজরত যাকারিয়া আ. এই আমানত গ্রহণের সৌভাগ্যবান পুরুষ নির্ধারিত হলেন।

একদিকে মরিয়ম ছিলেন এতিম কন্যা, অন্যদিকে দেশে তখন চলছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। এই দুটি কারণ মুখ্য না হলেও– যেহেতু মরিয়ম ছিলেন তাঁর মায়ের মান্নত অনুযায়ী 'হায়কালের মান্নত'; সে কারণেই একজন নেককার মুত্তাকী এবং নির্ভরযোগ্য সৎ মানুষকেই বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলো। আর প্রত্যাশিত তিনি হলেন হজরত যাকারিয়া আ.। অতএব হজরত যাকারিয়া আ. এর প্রত্যক্ষ স্নেহের ছায়ায় হজরত মরিয়ম বেড়ে উঠতে লাগলেন।

মরিয়ম ছিলেন জন্মসূত্রে মুত্তাকী। দিবানিশি স্রষ্টার ইবাদতে মগ্ন থেকে হায়কালের খিদমতের সুনিপুণ আঞ্জাম দিতে লাগলেন তিনি।

হজরত যাকারিয়া আ. মরিয়মের দেখাশোনার প্রয়োজনে কখনো কখনো তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন। একদা তিনি মরিয়মের নির্জন প্রকোষ্ঠে ঢুকে দেখলেন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তিনি দেখলেন একটা সুদৃশ্য তশতরীতে অসময়ের এক গুচ্ছ লোভনীয় তাজা ফল-ফলাদি। এ যে অলৌকিক ঘটনা। হজরত যাকারিয়া আ. বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে মরিয়ম! এসব কি দেখছি? অসময়ের এই তাজা তাজা ফল কোত্থেকে পেলে মা?

মরিয়ম বিনীত ভঙ্গিতে বললেন– এটি আমার প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান, অচিন্তনীয়ভাবে রিজিক প্রদান করেন.....

অতএব আর বাক্যব্যয় নয়, হজরত যাকারিয়া আ. এর এটা বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, মহামহিম প্রতিপালকের দরবরে মরিয়মের মর্যাদা অতি উচ্চে। তিনি এক বুক প্রত্যাশা ও সমীহ নিয়ে প্রকোষ্ঠ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

নারী কি নবী হতে পারেন ?

হজরত মরিয়ম আ. কি নবী ছিলেন?

নারী কি নবী হতে পারেন? জটিল প্রশ্ন– সন্দেহ নেই। আবুল হাসান আশআরী, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম কুরতবী এবং আল্লামা ইবনে হাযমের মতে– মহিলারা নবী হতে পারেন। ইবনে হাযমতো দাবি করেই বসলেন– বিবি হাওয়া, বিবি সারা, বিবি হাজেরা, উম্মে মুসা, বিবি আসিয়া এবং হজরত মরিয়ম আ. সবাই নবী ছিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক মত প্রকাশ করেন, অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে হচ্ছে–

মহিলারাও নবী হতে পারেন।

ইমাম কুরতবী আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, হজরত মরিয়ম আ. নবী ছিলেন।

অন্যদিকে হজরত হাসান বসরী, ইমামুল হারামাইন শায়েখ আব্দুল আজীজ এবং কাজী আইয়ায দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, মহিলারা নবী হতে পারেন না। অর্থাৎ হজরত মরিয়াম নবী ছিলেন না। কাজী আইয়ায এবং আল্লামা ইবনে কাসীর আরো বলেন, জমহুরেরও এটাই অভিমত। ইমামুল হারামাইন তো ইজমার দাবী পর্যন্ত করেছেন।

তাঁরা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেছেন ঃ

'মসীহ ইবনে মরিয়মতো একজন রসূল মাত্র। তার পূর্বে আরো অনেক রসূল অতীত হয়েছে। তার মা ছিলো একজন সত্যপন্থী মহিলা।' (সুরা মায়িদাঃ৭৫)।

অন্য পক্ষ বলেছেন– হজরত মরিয়ম আ. কে সত্যপন্থী বা সিদ্দিকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, –সেটা তাঁর নবী হবার পক্ষে অন্তরায় নয়। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন, যেমন হজরত ইউসুফ আ.কেও বলা হয়েছে 'ইউসুফ-হে সত্যপন্থী (সিদ্দিক)' (সুরা ইউসুফ ঃ৪৬) অথচ ইউসুফ আ. সর্বসমর্থিতভাবে একজন নবী। অনুরূপভাবে মরিয়ম (আ.) সিদ্দিকা হওয়া সত্ত্বেও নবী হওয়ার স্বপক্ষে অন্তরায় কোথায়?

কতিপয় বিশেষ আলেম নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের মতবিরোধের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেনঃ 'তোমার পূর্বে আমরা যে নবী রসূল পাঠিয়েছি তারা সকলে পুরুষই ছিলো। আমরা তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি।' (সুরা ইউসুফঃ ১০৯।) তাহলে ওহী কি?

নবী ও রসূলদের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে জ্ঞান-গর্ভ, সত্যনির্ভর সংবাদ প্রক্ষেপণ কি ওহী? যুক্তিবাদীদের ব্যাখ্যা হয়তো আরো ব্যাপক। আমরা সেদিকে না গিয়ে বরং ওহী সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি।

যুক্তিবাদীদের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছেঃ কতিপয় মহিয়সী নারী ওহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সূরা হুদ এর আয়াতে বর্ণিত ঘটনা, ফেরেশতাগণ ইসহাকের মাতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসহাকের জন্ম-সুসংবাদ এবং পরবর্তীতে ইয়াকুবের জন্ম-সন্দেশ শুনিয়েছিলেন। বিবি সারাহকে অবাক হতে দেখে ফেরেশতাগণ প্রশ্ন রাখলেনঃ 'আল্লাহর হুকুমের উপর আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো.....?'

হজরত মুসা আ. এর মাতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা যায়.... তোমার সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দাও.... এই সন্তান আবার তোমাকে ফেরত দেবো এবং তাকে নবী বানাবো.....

অন্যত্র হজরত ঈসা-জননী মরিয়মকে কুমারীত্বে (বিবাহপূর্ব) অবস্থায় হজরত মসীহর আ. এর অলৌকিক জন্ম-সন্দেশ শুনালেন আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতা জিব্রিল আমিনের মাধ্যমেঃ.... 'আমি তো তোমার রবের প্রেরিত, যেনো তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করতে পারি'.....(সুরা মরিয়ম)।

... একদা হজরত মরিয়ম বিশেষ প্রয়োজনে একটি নির্জন স্থানে ছিলেন। চারপাশে পর্দার অন্তরাল। সহসা তথায় একজন সুদর্শন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটলে মরিয়ম বিব্রত ও আতঙ্কিত হলেন ঃ কে আপনি? কেনো এখানে এসেছেন? কি চান আপনি.....? শংকামিশ্রিত বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে সুদর্শন পুরুষটি বিনীতভাবে বললেনঃ..... আমি তো তোমার প্রতিপালকের বার্তাবাহক মাত্র। ..... তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ শোনাতে এসেছি মরিয়ম.....

এসব কি বলছেন? আমি তো বিবাহিতা নই, দুশ্চরিত্রাও নই... কীভাবে আমার পুত্র সন্তান সম্ভব হবে.....?

.....আল্লাহ্‌তায়ালা যেভাবেই ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন.... তিনি তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে অসীম কুদরতের নিদর্শন বানাবেন..... তোমার পুত্র, যিনি হবেন তাঁর 'কলেমা'। যার উপাধি হবে মসীহ অর্থাৎ বরকতময় এবং নাম হবে ঈসা..... দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি হবেন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী....আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে কিতাব দান করবেন, তিনি হবেন রসুল....। জ্যোতির্ময় পুরুষ জিব্রিল আমীন এ ধরনের সংবাদ শুনিয়ে মরিয়মের জামার কলারের নীচে ফুঁক দিলেন অতঃপর অদৃশ্য হলেন।

মরিয়ম ঘটনার আকস্মিকতায় মূক বনে যান। এত বড় অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনাটি মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারলেন না।

দিন যায় মাস যায়..... মরিয়ম ক্রমশ স্বীয় অস্তিত্বের মর্মমূলে এক অনাগত শিশুর প্রাণস্পন্দন শুনতে পেলেন। ফলতঃ তার দুর্ভাবনা, উদ্বেগ, গর্ভের সন্তানকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছেই। কুৎসা,. নিন্দাবাদ নিয়ে একটি কলংকিত অধ্যায় রচিত হলে মরিয়ম বেঁচে থাকবেন কীভাবে?

তার আগে কি মৃত্যু শ্রেয় নয়?

না। কে যেনো নিজের ভেতর থেকে গর্জে উঠলো।

বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। শিশু সন্তানকে তাঁর নিজ পরিচয়ে বেড়ে উঠতে দিতে হবে.....। মরিয়ম শিউরে উঠলেন।

তাহলে?

তাহলে কি নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াতে হবে? দূর অঞ্চলে চলে যেতে হবে তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার প্রাক্কালে?.... আমি কি সত্যি নবী জননী? মরিয়ম তখন দ্বন্দ্বিত। ইতোপূর্বে হজরত মরিয়মকে আমরা তাই দ্বন্দ্বিত মনে বেথেলহাম নির্জন প্রান্তরে এমনি উদ্বিগ্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি এবং তিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু সন্তানসহ নিজ শহরেও ফিরে এসেছিলেন, তাও দেখেছি। অতঃপর নবী হওয়া না হওয়ার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি ও অভিমত শুনেছি।

রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই পূর্ণতায় পৌঁছেছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে দুইজন পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। একজন ইমরান কন্যা মরিয়ম এবং মুহাহিম কন্যা ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।"

আকাশে উজ্জ্বলতম তারকা.....

মসীহ ঈসা আ. এর জন্মগ্রহণের পূর্বাহ্নে পারস্যের শাসক রাত্রের আকাশে একটি অদ্ভুত উজ্জ্বলতম নক্ষত্র দেখতে পেয়েছিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট নৃপতি এই রহস্যের দ্বার উন্মোচন করার প্রয়াসে তাৎক্ষণিকভাবে রাজ জ্যোতিষীদেরকে ডেকে পাঠালেন।

জ্যোতিষীগণ আদেশ পেয়ে প্রথাগত গণনায় নিযুক্ত হলো এবং বিস্ময়ের সঙ্গে নৃপতিকেতাদের গণনার ফলাফল জানালো..... মহারাজ, এই নক্ষত্র এক মহান ব্যক্তিত্বের আগমনবার্তা বহন করছে।

তার মানে? নৃপতি ব্যাখ্যা চাইলেন।

গণকেরা জানালো, মহারাজ, গণনায় আমরা যতখানি উপলব্ধি করেছি, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে– সেই মহান ব্যক্তিত্ব ইতোমধ্যেই সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন..... তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থের বিশেষজ্ঞ ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ তার বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া মথিলিখিত সুসমাচারেও অনুরূপ বর্ণনার উল্লেখ আছে।

পারস্যের নৃপতি এহেন খবরে যারপরনাই উৎসাহী হলেন। তিনি অদম্য কৌতূহলে তাড়িত হয়ে এই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী আধ্যাত্ম শিশুটির জন্মরহস্য অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয়ে সর্বোত্তম সুগন্ধি উপঢৌকন সহযোগে সিরিয়ায় একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন।

যথাসময়ে প্রতিনিধি দল সিরিয়ায় পৌঁছে গেল। তারা অনুসন্ধান কাজে ব্যাপৃত হয়ে ইহুদীদের কাছেও এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইহুদীগণ এ ধরনের খবর শুনে অবাক। শুধু অবাক বা বলি কেনো, ঈর্ষণীয় কৌতূহলে বাদশাহ্ হেরোদের দরবারে ছুটলো, বাদশাহ্কে খবরটি অবহিত করতে।

বাদশাহ্ হেরোদ সবকিছু শুনে গম্ভীর হলো। তাৎক্ষণিক নির্দেশে প্রতিনিধি দলকে দরবারে তলব করলো। এবং আনুপূর্বিক ঘটনাটি শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলো। হেরোদ প্রতিনিধি দলকে এই আধ্যাত্মিক শিশু সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করলো।

তথ্যানুসন্ধান চলছে–চলছেই.....

আজ এখানে তো কাল ওখানে।

মহল্লায়-মহল্লায় খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা একদা বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে ইপ্সিত এই আধ্যাত্মিক শিশুটিকে চিহ্নিত করলেন।

স্বদেশীয় প্রথামত প্রতিনিধিবর্গ অতি বিনীতভাবে ও তাজিমের সাথে আধ্যাত্মিক শিশু মসীহ্ ঈসা আ.কে সম্মানসূচক সিজদা করলেন। অতঃপর সুগন্ধির পশরা উপঢৌকন হিসেবে উৎসর্গ করলেন তাঁকে।..... এ যেনো এক শব্দহীন মহাসমুদ্রকে প্রত্যক্ষ করছেন তাঁরা এবং সেই মহান সমুদ্রের অন্তহীনতাকে নীরবে পাঠ করে তাদের মনে হলো, বহু লক্ষকোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে একটি অলৌকিক নক্ষত্রের আলোকপিণ্ড পৃথিবীতে ছিটকে পড়েছে....? এ যে তাদের কাছে স্বপ্নময় অবগাহন....

রাত্রির অবসান প্রায়।

প্রত্যুষ-প্রহর।

বাইরে নিঃঝুম ধূসর চরাচরের দিকে দৃকপাত করে কেউ কেউ তখন দারুণ ভাবিত।

কি হয়েছে ওদের? ওরা ভাবিত কেন?

কারণ, রাত্রে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন কেউ কেউ। এখনই তো তাদের স্বদেশ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কাল, কিন্তু যাত্রার আগে শিশু মাতাকে সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নটির কথা না জানিয়ে ওরা যায় কি করে?

বাদশাহ্ হেরোদ যে, এই আধ্যাত্মিক শিশুটির 'জানের শত্রু' হবে, এই সত্যটি শিশু মাতাকে না জানিয়ে গেলে ওঁরা যে স্বস্তি পাবেন না....

শিশু মাতা হজরত মরিয়ম প্রতিনিধিদলের দুঃস্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং আশংকার কথা নিবিষ্টচিত্তে শুনলেন। প্রতিনিধিদল আরো জানালেন, তিনি যেনো শিশু সন্তানকে নিয়ে বাদশাহ্ হেরোদের নাগালের বাইরে অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যান....

মরিয়মও ভাবলেন– তাই যাবেন তিনি....।

মাথার উপর হাজার বছরের প্রাচীন রোদ.....

চারপাশে অবিশ্বাসের শক্ত দেয়াল।

তিনি, মসীহ ঈসা আ. এখন প্রাপ্ত বয়েসে উপনীত। কিন্তু বড় একা তিনি। বিশ্বাসী মানুষের বড় অভাব অথচ হৃদয়ে তিনি ধারণ করে আছেন এক মহাসত্যকে। বিস্ময় শুধু এখানে নয়, তিনি সময়ের শুদ্ধতম উচ্চারণকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান। এজন্যে দীর্ঘতম রৌদ্রকে উপেক্ষা করে তিনি হেঁটেছেন পথে পথে। এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। হেঁটেছেন অরণ্য আর গুহার কাছে। মরুপ্রান্তর মাড়িয়ে মানুষের কাছে ছুটে গেছেন। শুনিয়েছেন সেই শুদ্ধতম উচ্চারণ– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ..... কিন্তু এই মহাসত্যবাণী বুকের মধ্যে লালন করবে কে বা কারা? ঘর্মাক্ত শরীরে, দ্রুততর স্বীয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে তিনি চলে গেছেন দূরে বহু দূরে। পশু-পাখি, অরণ্য, পাহাড়, বৃক্ষাদি কি শুনতে পেতো এই মহান নবীর হৃদয়ের নীরব আকুতি?

অন্ততঃ গণ-মানুষ তো পায়নি।

তেরো বছর বয়েসে নাসেরা থেকে পুনঃ ফিরে এসেছিলেন স্বদেশে মায়ের সঙ্গে। এই বিদেশ যাত্রার তো একটা কারণ ছিলো। বাদশাহ্ হেরোদের কোপানল থেকে বাঁচার তাগিদে মাতা মরিয়ম তাঁকে নিয়ে অতি শৈশবে মিশরের উদ্দেশ্যে স্বভূমি ত্যাগ করেছিলেন। মিশরে আত্মীয় ছিলো। আশ্রয় মিললো। সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় কেটেছে তাঁদের। কিন্তু স্রোতের শেওলা মাটি না পেলে, তাকে ভাসতেই হয়; তাঁরাও ভেসেছেন। মিশর থেকে নাসেরায়। নাসেরা থেকে আবার বাইতুল মুকাদ্দাস। কখনো পেয়েছেন স্নেহময় জীবনের স্বাদ, কখনো দুঃখের আঁচড়।

মসজিদুল আকসার আকাশমুখী মিনার, রঙিন ইটের ছাদ, মনোহর গম্বুজের দিকে তাকিয়ে কখনো কখনো তিনি আনমনা দাঁড়িয়ে থাকেন। আত্মমগ্ন হয়ে যান মসীহ ঈসা আ.। কী এতো ভাবেন তিনি? নিজেকে নিয়ে? না। মানুষের জন্যই তাঁর যত ভাবনা।

নিজের ঘর নেই। আশ্রয় নেই। শস্যের গোলা নেই। চাষের ক্ষেত নেই। খাদ্য নেই। ব্যবসার মূলধন নেই। আহার বিহারেও তাই নিয়মের গতি নেই। এজন্যে কোনো মনোবেদনাও নেই। তিনি পৃথক করতে পারেননি বৈভবিত জীবন যাপনকে ভাগাভাগি করতে পারেননি পার্থিব সুখ-দুঃখকে। তাই সুখ-দুঃখের পরিমাপ তাঁর ছোট। সীমাবদ্ধ।

ইতোমধ্যে মাতা মরিয়ম ইন্তেকাল করলেন। এখন আর কোনো নোঙর নেই। জীবন যাপনে যেনো নেমে এলো এক অটল ঔদাসীন্য। দুর্ভাবনা কেবল জাতির জন্যে। বনী ইসরাইলেরা তখন ইমান-আকীদায় ও আমলে ঘোরতর গোমরাহীর তিমির অন্ধকারে। বহুবিধ মতবাদে তারা বিভ্রান্ত। দিশেহারা। নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গির বাহুল্যে ভ্রান্তিবদ্ধ।

কেউ আবার বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমত ও ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকভাবে পালন করাকে ধর্মীয় অঙ্গ মনে করতো। মোদ্দাকথা– প্রকৃত তাওরাত কিতাবকে নিজেদের সুবিধার্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিলো 'কাহীন' দলভুক্ত লোকেরা। কেউ কেউ কেয়ামত, হাশর–নশর, শাস্তি-পুরস্কারকে বানোয়াট কথা মনে করতো। হজরত মসীহ ঈসা আ. তখন তাদেরকে হকের বাণী শোনাতে লাগলেন,.... হে জনগণ! আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তাঁর নবী ও রসূল করে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আমি মহা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছি। তোমাদের কাছে আল্লাহ্র যে বিধান (তাওরাত) রয়েছে এবং যে কিতাবকে তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা ও বক্রতার দ্বারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছো– আমি তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং সেই সত্যকে অধিক পূর্ণতায় পৌঁছে দেবার জন্য আমি আল্লাহ্র কিতাব (ইঞ্জিল) নিয়ে এসেছি.....

.....এই কিতাব হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করবে; সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিভেদ রেখা টেনে দেবে। আমার কথা শ্রবণ করো– হৃদয়ংগম করো, আল্লাহ্‌র সমীপে আনুগত্যের মাথা নোয়াও– এটাই দ্বীন এবং দুনিয়া, ইহকাল ও পারলৌকিক মুক্তি এবং কল্যাণের একমাত্র পথ.....। কিন্তু হায় হতোস্মি। এই সত্য কথন যেনো অরণ্যে রোদন মাত্র। প্রায় সবাই ভ্রূক্ষেপ করলো না।

নবী-রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীকে সৎপথ প্রদর্শন এবং পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন। প্রত্যাদেশ ছিলোঃ 'এবং আমরা অবশ্যই মুসাকে কিতাব (তাওরাত) দান করেছি। অতএব ক্রমাগতভাবে আমরা (তোমাদের মধ্যে) রসূল প্রেরণ করেছি। আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সহকারে পাঠিয়েছি। আমরা তাঁকে পবিত্র আত্মার (জিব্‌রাইল) এর মাধ্যমে সাহায্য করেছি। অতএব যখন তোমাদের কাছে (আল্লাহ্‌র) রসুল এমন বিধান নিয়ে আগমন করেন– তোমাদের মন যার উপর আমল করতে প্রস্তুত নয়– তখনই তোমরা কি আত্ম অহংকারকে নিজেদের নীতি ও অভ্যাস বানিয়ে নাওনি? অতঃপর (নবীদের) এক দলকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপাদন করেছো, এক দলকে হত্যা করেছো। আর তোমরা বলছো– আমাদের অন্তর (সত্যকে গ্রহণ করার জন্য) সুরক্ষিত রয়েছে। ব্যাপার তা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত (গজব) বর্ষিত হয়েছে। অতএব তাদের মধ্যে ইমান গ্রহণকারী লোক খুব কমই আছে' (সূরা বাকারা ঃ ৮৭-৮৮)।

মহান আল্লাহ্‌তায়ালা মসীহ ঈসা আ.কে বনী ইসরাইলদের পথ প্রদর্শক হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। তাঁকে ইঞ্জিল কিতাব প্রদান করলেন। বস্তুতঃ এই পবিত্র কিতাব ছিলো হজরত মুসা আ. প্রচারিত দ্বীনের নতুন সংস্করণ। হজরত মসীহ ঈসা আ. বনী ইসরাইলের মধ্যে দ্বীনের হুকুম আহকাম, হারাম হালালের কোন বাছ বিচার চলছে না প্রত্যক্ষ করলেন। সব কিছুকে বৈধ জ্ঞান করছে তারা। যাকে ইচ্ছা, তারা জান্নাতের সনদ প্রদান করছে। যাকে ইচ্ছা জাহান্নামের খাস দলিল দিচ্ছে। এই দলকে আহবার বলা হয়ে থাকে। মূল তাওরাতের অনেক হুকুম-আহকামকে সংগোপন করে, ইচ্ছা মত বাড়ানো-কমানো এদের কাজ ছিলো।

আবার কেউ কেউ পৃথিবীর জিন্দেগীতে 'বৈরাগ্যবাদের ধূসর জীবন যাপনই মুক্তির একমাত্র পন্থা'–জ্ঞান করতো।

মসীহ ঈসা আ. পথে-প্রান্তরে জনপদে মানুষের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে শোনাতে লাগলেন মহাসত্যের সুললিত বাণী– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ। কিন্তু কে শোনে কার কথা? কতিপয় অনুসারী ব্যতীত বাধ্য অনুগত আর কাউকে দেখতে পেলেন না হজরত ঈসা মসীহ আ.।

নবীর এই অনুগত অনুসারী যারা, তাঁদেরকে বলা হতো হাওয়ারী। তাঁরা সাদা বস্ত্র পরিধান করতেন বলেই কি তাদের হাওয়ারী বলা হতো? হজরত হাসান র. এবং সুফিয়ান র. এর মতে তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা ছিলো বিধায় তাঁরা নবীর সাহায্যকারী ছিলেন.....।

হজরত জাহাক র. এর বর্ণনা মতে– এই সাহায্যকারীদের অন্তর পাপমুক্ত ছিলো, তাই এদেরকে হাওয়ারী বলা হতো।

আল্লামা কালবী এবং আকরামা র. এর মতে, 'তাঁরা অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আর সংখ্যায় ছিলেন বারো জন।' এজন্যে কি হাওয়ারী বলা হতো? কে জানে সঠিক কোনটি।

লোভ, মৃত্যুকে হাতছানি দেয়.....

চারপাশে বুনো আঁধার।

উচ্ছল আদিমতা। শত্রুদের চোখে হননের নেশা। তবু তিনি মানুষের কাছে বিনীত। কারণ স্বীয় অস্তিত্বের মাঝে তিনি শুনতে পান অসীমের স্পন্দন।

জনারণ্যে তিনি একাকী।

স্রষ্টার স্মরণে তবু সদা-মগ্ন।

তিনি লোকালয় ছেড়ে কখনো কখনো নির্জনে চলে যেতেন। আকারবিহীন শূন্যতাকে পাঠ করতে চাইতেন হজরত মসীহ ঈসা আ.। পৃথিবীর মানুষ আর নিসর্গ তার আত্মার আত্মীয়।

ঘর নেই। আশ্রয় নেই। ঘরের মানুষের জন্য তাই পিছুটানও নেই। রাত্রিময় নিরুদ্দেশ থাকলেও কেউ খোঁজেন না তাঁকে। কোনো বৈষয়িক ও জাগতিক আশ্রয় তাঁর ছিলো না। ব্যথিত নবীর অন্তর কাঁদতো কেবল মানুষের জন্যেই।

হজরত মসীহ ঈসা আ. জীবন ও জগত সম্পর্কে কিছু উন্নাসিকও ছিলেন না। সংসারের প্রয়োজনকে তিনি স্বীকার করেন ঠিকই, অথচ নিজে রচনা করেন না কোনো ব্যক্তিগত সংসারবৃত্ত।

তিনি কষ্টসহিষ্ণু। স্বল্পআহারী। অল্পে তুষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা যাতে রাজী, তিনিও তাতে রাজী।

হাওয়ারীগণ দারুন ব্যথিত নবীর এহেন জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করে। একদিন তাঁরা নবীকে বললেন– হে আল্লাহর নবী!.....আমরা আপনার জন্যে একখানা মজবুত বাসস্থান নির্মাণ করতে চাই–

তিনি বললেন, তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

সত্যি কি নেই হজরত? বেদুঈনদেরও তো একটা নিজস্ব আশ্রয় আছে, আপনার তাও নেই।

মসীহ ঈসা আ. স্মিত হেসে নীরব হয়ে গেলেন। তিনি তখন হাওয়ারীগণ সহকারে একটা নির্জন নদী তীরে গমন করলেন এবং নদীর ঢেউয়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এ ঢেউয়ের উপরে আমার একখানি গৃহ নির্মাণ করে দিতে পারো?

সেটা কি সম্ভব হজরত?

তাহলে জেনো, দুনিয়াও ঐ নদীর ঢেউয়ের মতো ক্ষণস্থায়ী। কোন্ আশায় এই নশ্বর পৃথিবীতে গৃহ নির্মাণ করবো.....?

তিনি আরো বললেন, এই পৃথিবীতে মাটির মত উত্তম বিছানা আর কিছু হতে পারে না.....

সম্পদের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ ছিলো না তাঁর। একখণ্ড পাথর ও এক খণ্ড স্বর্ণকে সমান জ্ঞান করতেন মসীহ ঈসা আ.।

কথিত আছে–

তিনি একদা তিন সহচরকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও ভ্রমণ করছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন দুইখণ্ড স্বর্ণের ইট মাটিতে পড়ে আছে।

লোভাতুর সঙ্গীরা স্বর্ণের ইট দু'খানা উঠিয়ে নিতে চাইলো, আল্লাহ্র নবী ঈসা মসীহ আ. তাদেরকে নিরস্ত করতে চাইলেন। বললেন, খবরদার, স্পর্শ করো না, এটা অত্যন্ত মন্দ বস্তু; যেভাবে আছে ঠিক ঐভাবে পড়ে থাকতে দাও– নইলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

লোকগুলো আপাতঃ নিরস্ত হলেও লোভের ভয়ঙ্কর কীটেরা কুরে কুরে খাচ্ছিলো তাদেরকে। মনে মনে নানান ফন্দি ফিকির আঁটতে আঁটতে পথ চলতে লাগলো তারা।

তাঁদের ফিরতি পথ ছিলো একই। অর্থাৎ হজরত ঈসা মসীহ আ. গন্তব্য স্থান থেকে পুনরায় ঐ পথেই ফিরছিলেন। সঙ্গে তখনো সহচরত্রয়। পূর্বোক্ত স্বর্ণের ইট দু'খানা যথাস্থানে তখনো পতিত ছিলো। এবং আশ্চর্য! স্বর্ণ-ইটের পাশেই তিনটি মানুষের লাশ বিদ্যমান। ঘটনা কি? কৌতূহল প্রশমিত হলো না সহচরত্রয়ের। হজরত ঈসা মসীহ আ. কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলো তারা, হে আল্লাহর নবী! আমাদের কৌতূহল জেগেছে; ঐ তিনটি মানুষের কিভাবে মৃত্যু ঘটলো?

নবী স্মিত হেসে বললেন, ঐ লোক তিনটি পথ চলাকালে তোমাদের মতই স্বর্ণ-ইট দু'খানা পেতে চেয়েছিলো। এদের মধ্যে দুইজন স্বর্ণ-ইট দু'খানার পাশে প্রহরায় থেকে, অন্যজনকে কিছু খাদ্য ক্রয় করার জন্যে নিকটস্থ বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে তারা ফন্দি আঁটলো, বাজার থেকে ফিরে এলেই দু'জন একত্রে মিলিত হয়ে অন্যকে আক্রমণ করে হত্যা করবে।

অপরদিকে সওদাক্রেতা লোকটিরও মনে ছিলো দুরভিসন্ধি। সেও খাদ্য ক্রয় করে, তাতে বিষমিশ্রিত করে নিলো পথিমধ্যেই। উদ্দেশ্য একই। সঙ্গী দু'জনকে হত্যা করে স্বর্ণের দু'খানা ইট সে একাই আত্মসাৎ করবে।

ফলাফল যা হলো, তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছো। অর্থাৎ স্বরণ রেখো, দুনিয়া এভাবেই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে।.... লোভ-মৃত্যুকে হাতছানি দেয়....।

মনের মুক্তি কোথায় ?

আসলে মনের মুক্তি কোথায়?

ভোগে? না ত্যাগে? না আত্মশুদ্ধির পথে? একটা বৃহত্তর বেদনা নিরন্তর মথিত করতো আল্লাহ্‌র নবী মসীহ ঈসাকে। মানুষের অবহেলা, তাচ্ছিল্য, ঘৃণায় অহরহ হৃদয় দগ্ধ হতো তাঁর, তবু ভালোবাসা আছে, অগাধ প্রীতি আছে মানুষের জন্যে। তবু তিনি শোনাতে চান মানুষকে তওহীদের বাণী।

হাতে একটা মাত্র পানির পাত্র।

জীর্ণ এলোমেলো পরিধেয়। রুক্ষকেশ, সম্বল একটি কম্বল। তাই নিয়ে মানুষ কিংবা পাহাড়, পর্বত, মরু প্রান্তর, পাখি পশুদের মাঝে গিয়ে তিনি দাঁড়াতেন। তিনি একজন ব্যথিত নবী।

এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছেঃ একদা তিনি নাসিবীন শহরে যাবার জন্যে মনস্থির করলেন। নাসিবীন শহরে তখন একজন দ্রোহী নৃপতি ছিলো। নৃপতি স্বয়ং এবং প্রজাগণও কাফের ছিলো।

আল্লাহ্‌র নবী মসীহ ঈসা আ. দ্রোহী নৃপতিকে এবং প্রজা সাধারণকে হেদায়েতের বাণী শোনাতে কতিপয় হাওয়ারীসহ নাসিবীন শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

পথিমধ্যে শহরের নিকটবর্তী একস্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে হজরত ঈসা মসীহ আ. তাঁর অনুগামী উম্মতদেরকে ডেকে বললেন– তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে, এদেশের বাদশাহ্‌কে আমার আগমন বার্তা পৌঁছে দিতে পারবে?

ইয়াকুব নামক এক হাওয়ারী তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিলো– আমিই পৌঁছে দিতে পারবো হুজুর।

অন্য একজন বললো– আমি হচ্ছি তাউমান, আপনি অনুমতি দিলে আমিও পারবো ইয়াকুবের সঙ্গে যেতে।

এরপর শামাউন নামক আরেকজন হাওয়ারীও নাসিবীন যাত্রার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

তিন জনকেই একত্রে যাত্রার অনুমতি দেলেন হজরত ঈসা মসীহ আ. কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তিনি প্রথম জনকে বললেন– হে ইয়াকুব। বড় দুঃখের বিষয়, সর্বপ্রথম যেভাবে আমার আদেশ পালন করতে তুমি আগ্রহ প্রকাশ করলে, ঠিক অনুরূপভাবে তুমিই আমার থেকে প্রথম মুখ ফিরিয়ে নেবে। এবং হে তাউমান! তুমি কোনো বিপদে পড়বে না.... তোমরা যাও।

অতঃপর সঙ্গীরা একত্রে নাসিবীন শহর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো।

কিছুদূর গিয়ে তাঁরা একস্থানে থেমে পড়লো।

শামাউন অন্য দু'জনকে বললো, আমি এই স্থানে অপেক্ষা করছি। তোমরা দু'জনে গিয়ে বাদশাহ্‌কে মসীহ আ. এর আগমনবার্তা শোনাও। যদি কোনো বিপদ এসেই পড়ে আমি সেটা সামাল দেবো।

ওরা তিনজন চলে যায়।

বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যগগনে সূর্য জ্বলছে।

শহরের মধ্যস্থলে এসে ইয়াকুব উচ্চকিত স্বরে শহরবাসীকে শুনিয়ে হেঁকে উঠলো– হে শহরবাসী শোনো! আজ তোমাদের সৌভাগ্যের দিন, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র নবী-মসীহ ঈসা রুহুল্লাহ তসরীফ এনেছেন..... তাঁর অমর বাণী শ্রবণ করো.....দ্বীনে ইসলামে সামিল হয়ে যাও.....

শহরের অনেক লোক ভীড় জমালো।

তাদের মধ্যে নেতা ধরনের একজন ভীড় ঠেলে ইয়াকুবের খুব কাছে এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে কে এই আওয়াজ তুলেছে?

ইয়াকুব প্রমাদ গুণলো। জড়সড় শঙ্কিত ভঙ্গিতে নীরবতা পালন করলো। কিন্তু তাউমান নির্ভীকভাবে বললো-একথা আমি বলছি.....

নেতা লোকটি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাউমানকে গ্রেফতার করলো এবং বাদশাহের দরবারে নিয়ে হাজির করলো।

বাদশাহ্‌ ঘটনাটি পৌনঃপুনিক শ্রবণ করে হুংকার ছেড়ে বললো, ওহে বেকুব! যে লোকটির দুর্নাম আমরা ইতোপূর্বে যথেষ্ট শুনেছি, কোন্‌ সাহসে তুমি তাকে আল্লাহ্‌র নবী বলে ঘোষণা দিচ্ছো?

আমি যা সত্য জেনেছি, তাই বলেছি বাদশাহ্ নামদার।

তোমার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি, এর পরিণাম কি ভয়ংকর, তুমি জানো?

জানি। আপনি অতি সামান্যই ক্ষমতাবান....

খামোশ! কৈ হায়-! এই কমবখ্তকে জল্লাদখানায় নিয়ে যাও.....

বলাবাহুল্য তাউমানকে তাৎক্ষণিকভাবে জল্লাদখানায় নিয়ে পৈশাচিকভাবে নির্যাতন শুরু করে দিলো। তাউমানের হাত পা টুকরো টুকরো করে কেটে পূঁতি গন্ধময় অন্ধকার কুঠি ঘরে নিক্ষেপ করা হলো।

তাউমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ইয়াকুব ফাঁক বুঝে কেটে পড়ছিলো এবং সে ছুটতে ছুটতে শামউনকে খবরটি পৌঁছে দিলো।

শামাউন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে ঠাণ্ডা মাথায় বাদশাহের দরবারে হাজির হয়ে বিনীত আরজ করলো, হে বাদশাহ্ নামদার! আমার একটি আরজ আছে, যদি অভয় দেন তো বলি.....

বেশ বেশ অভয় দেয়া হলো-। আমি সেই বন্দী লোকটিকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই, তাকে, দরবারে হাজির করার অনুমতি দিন....

আবেদন মঞ্জুর হলো। জখমে ক্ষত-বিক্ষত তাউমানকে হাজির করা হলে শামাউন সবাইকে শুনিয়ে বন্দীকে প্রশ্ন করলো, ওহে ভাই! মসীহ ঈসা যে আল্লাহ্র নবী, তোমার এ কথার যুক্তি কোথায়?

যুক্তি অবশ্যই আছে। তাউমান তখনো শঙ্কাহীন।

তোমার কথার দলিল কি?

আল্লাহ্র নবীর অনেক মো'জেজা আছে।

যেমন?

যেমন অন্ধকে চক্ষুষ্মান করা, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করেন তিনি....

এটাতো চিকিৎসকরাও করতে পারেন।

তাউমান বললো– মানুষ তার নিজ নিজ ঘরে যখন, যা কিছু পানাহার করে এবং আগামী দিনের জন্যে কি কি রেখে দিয়েছে, তাও সঠিকভাবে তিনি বলতে পারেন।

গণকেরাও তা বলতে পারে।

তিনি মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে ফুঁক দিলেই জীবন্ত হয়ে তা উড়ে যায়।

যাদুকরদের অনেকেই এটা পারে।

তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন।

শামাউন এবার বললো– মসীহ ঈসা যদি সত্যিই কোনো মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন, তাহলে তিনি যে আল্লাহ্র মনোনীত নবী ও রসূল, এতে কোনো সন্দেহ থাকবে না। কারণ, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার শক্তি কোনে যাদুকরের

নেই। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অতি প্রিয়বান্দাদের দ্বারাই সংঘটিত করে থাকেন.....।

শামাউন অতঃপর বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, হে বাদশাহ্ নামদার। আপনি হুকুম দিন, হজরত ঈসা মসীহকে এই দরবারেই হাজির করা হোক। তখন সত্যতা যাচাই করে দেখা যাবে।

শামাউনের কথাবার্তা বাদশাহের খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হলো। বাদশাহ্ কালবিলম্ব না করেই হজরত ঈসা মসীহ্ আ.কে দরবারে হাজির করতে নির্দেশ দিলেন।

যথারীতি পালিত হলো আদেশ। আল্লাহ্র নবী হজরত ঈসা মসীহ আ. দরবারে নীত হয়ে সবকিছুই শ্রবণ এবং প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি সমবেত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! বলুন! এখন কি কি মোজেজা আপনারা দেখতে চান?

শামউনই জবাব দিলো, হে জনাব, আপনিতো শুনেছেন, তাউমানের হাত এবং পা কর্তন করা হয়েছে। যদি আপনি সত্যি আল্লাহ্র নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তার হাত পা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।

হজরত ঈসা মসীহ আ. অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ্র নাম নিয়ে তার পবিত্র হাত দিয়ে তাউমানের কর্তিত হাতে ও পায়ে স্পর্শ দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা পূর্ববৎ ভালো হয়ে গেলো।

একে একে তিনি অনেকগুলো মোজেজা প্রদর্শন করলেন। সর্বশেষে প্রস্তাবিত মৃত মানুষকে জীবিত করার পালা। কিন্তু কোন্ কবরের মানুষকে জীবিত করবেন তিনি?

উপস্থিত জনতা বহুদিনের প্রাচীন একটি কবর দেখিয়ে দিলো।

হজরত ঈসা মসীহ আ. প্রাচীন কবরটির পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে 'কুম বিইজনিল্লাহ' বাণীটি উচ্চারণ করলেন (অর্থাৎ হে মৃত ব্যক্তি! আল্লাহ্র আদেশে জীবিত হয়ে উঠে আসুন)।

কবরটি অকস্মাৎ কেঁপে উঠলো।

এবং ফেঁটে চৌচির হয়ে গেলে একজন সফেদ চুল দাড়িতে আকীর্ণ পুরুষ কবর থেকে বেরিয়ে এসে সালাম জানালেন, 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া ঈসা রুহুল্লাহ'।

আল্লাহ্র নবী ঈসা মসীহ্ আ. তাৎক্ষণিক সালামের জবাবও দিলেন।

কে আপনি?

কবরবাসী পুরুষটি জবাবে জানালেন, আমি শাম ইবনে নূহ আ.।

কতদিন ধরে আপনি কবরবাসী?

প্রায় চার হাজার বছর।

আপনার চুল-দাড়ি এতো শাদা হবার কারণ কি?

দুশ্চিন্তায় এবং ভয়ে। আমি ভেবেছি, হয়তো কেয়ামতের ডাক এসেছে....

আমার সম্বন্ধে কিছু কি জানেন?

নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।

দুনিয়ায় পুনঃ বসবাসের আকাঙ্খা হয় না আপনার?

না। ফায়দা কি? মৃত্যু যন্ত্রণা কত কষ্টের, আমার চেয়ে কে আর ভালো জানে? বরং হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন, আমি যেনো আল্লাহ্‌তায়ালার কৃপা পেতে পারি....

অতঃপর হজরত ঈসা মসীহ্ আ. এর অনুমতি প্রার্থনা করে, শাম ইবনে নূহ আ. পুনরায় কবরে প্রবেশ করলেন।

এতদর্শনে দ্রোহী বাদশাহ্ সহ উপস্থিত প্রজাসাধারণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তাদের সমগ্র সত্তা জুড়ে একটি কথাই উচ্চারিত হলো।

আসলে সত্যের মৃত্যু নেই.....

পাঁচটি রুটি, পাঁচটি খোরমা এবং একটি ভূনা মাছ

ষড়যন্ত্র থেমে নেই।

ফরীশী, কাহেন সম্প্রদায় এবং একশ্রেণীর তথাকথিত আলেম ও যাদুকররা আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগলো।

তবু প্রতিদিনই ঘুরছেন তিনি।

তিনি তো যেতে চান মানুষের অন্তরের কাছে। কিন্তু বড় রুক্ষ হয় প্রতিপক্ষ। তিনি যতই এগিয়ে যান, ওরা পিছিয়ে যায় তত। বড় বিরূপ আচরণ পান তাদের কাছে।

উটের পিঠের মত উপত্যকা, রৌদ্রেরা ঝিলিমিলি খেলা করে প্রান্তরে এবং প্রান্তরের মধ্যপথে ঈগলের ডানার ছায়া ওড়ে। এসব দেখতে দেখতে আত্মমগ্ন হয়ে যান হজরত ঈসা মসীহ আ.। যখন মনে দারুণ বিষাদ নামে তখন নিসর্গের মাঝে আত্মমগ্ন হয়ে যান তিনি। উদার হাওয়ারা কোমল স্পর্শে বিষাদ ক্লান্ত মনকে ছুঁয়ে যায়।

একদিন।

কোথাও চলেছেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ারীগণও চলেছেন।

পথ চলতে চলতে এক সময় হাওয়ারীগণ নবীর কাছে আরজ করলো, হে আল্লাহর নবী! আমাদের প্রভু আমাদের জন্যে আকাশ থেকে কিছু খাদ্য নাযিল করতে পারেন কি...? আসলে সঙ্গীর একদল অবিশ্বাসী ইহুদীর পরামর্শে হাওয়ারীগণ নবীর নিকট এই বায়না ধরেছিলো।

হজরত ঈসা মসীহ আ. অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি স্বীয় অনুসারী সহ গোটা কওমকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তবে এই আবদার পরিত্যাগ করো... আল্লাহ্কে ভয় করো.... তোমরা কি এখনো সন্দেহ করো, আল্লাহ্তায়ালা সর্বশক্তিমান নন? আল্লাহ্কে পরীক্ষা করা শোভনীয় নয়।

না, তা নয় হজরত। পরীক্ষা করার দুঃসাহস আমাদের নেই।

তাহলে?

আমাদের বিনীত বাসনা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি কিছু খাদ্য নাযিল হলে আমরা অধিক পরিমাণে শোকর গুজারী হই.... এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, খাদ্য অন্বেষণের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র এই দানকে নিজের জন্য নির্ভর বানিয়ে আপনি যে সত্য নবী-আমাদের এই বিশ্বাস, এই মোজেজা দর্শনে বনী ইসরাইলেরাও কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে যেনো আপনার প্রতি সত্য নবী হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে যায়....।

কিয়ৎকাল কিছু চিন্তা করলেন মসীহ ঈসা আ.। অতঃপর আল্লাহ্ সমীপে সবিনয় প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আসমান থেকে একটি খাদ্যের খাঞ্চা নাযিল করুন..... তা যেনো আমাদের জন্যে আপনার অভিসম্পাতের কারণ না হয়। বরং আমাদের পূর্বাপর সবার জন্যে তা যেনো স্মরণীয় আনন্দ উৎসবে পরিণত হয় এবং আপনার নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়।

কাসাসুল কুরআনের এই বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

....প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই প্রত্যাদেশ এলোঃ 'হে ঈসা! আপনার প্রার্থনা কবুল করা হলো। আমি অবশ্যই তা নাযিল করবো। কিন্তু এই সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযিল হওয়ার পর যদি তাদের কোনো ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে তাহলে এমন ভয়ংকর শাস্তি তাদের প্রদান করবো, যা পৃথিবীর আর কোনো মানুষকে দেয়া হবে না।'

আল কুরআনে এই ঘটনাটি মোজেজাসুলভ ভংগীতে বর্ণিত হয়েছেঃ 'আরও (দেখ) যখন এরূপ হয়েছিলো যে, হাওয়ারীগণ বললো, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! আপনার প্রতিপালক আসমান থেকে আমাদের জন্য খাদ্যে পরিপূর্ণ একখানি পাত্র নাযিল করতে পারেন কি? ঈসা বললেন, আল্লাহ্কে ভয় করো (এবং এ ধরনের আবেদনে বিরত থাকো).. তারা বললো, আল্লাহ্র শক্তি পরীক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়.... বরং যদি খাবার এসে যায়.... তা খেয়ে আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারবো যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা এর উপর সাক্ষী হয়ে থাকবো। এ সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! আসমান থেকে আমাদের জন্য খাদ্যে পরিপূর্ণ একটি পাত্র নাযিল করো....।' সুরা মায়িদা (১১২-১১৫)

খাদ্যের পূর্ণ পাত্র নাযিল হয়েছিলো কিনা আল কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কোনো মরফু হাদীসেও এর কোনো বর্ণনা না পাওয়া গেলেও সাহাবা ও তাবেঈনদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মুজাহিদ এবং হজরত হাসান বসরী র. এর অভিমত ছিলো– খাবারের পূর্ণ পাত্র নাযিল হয়নি। কারণ অত্যন্ত কঠিন শর্ত পূরণের ভয়ে ভীত হয়ে আবেদনকারীগণ নিজেদের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো।

অপরপক্ষে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. এবং হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো এবং খাবারের খাঞ্চা নাযিলও হয়েছিলো। জমহুরের আলেমগণেরও অভিমত ছিলো তাই। অবশ্য কিভাবে নাযিল হয়েছিলো, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। এই খাবার কি একদিন নাযিল হয়েছিলো? নাকি একাধারে চল্লিশদিন পর্যন্ত নাযিল হয়ে বন্ধ হয়েছিলো? কেনো বন্ধ হয়েছিলো? তাফসীরে বলা হয়েছে, নাযিলকৃত খাবার সম্পর্কে নির্দেশ ছিলো কেবল গরীব মিসকিন ও রোগীরা ভক্ষণ করতে পারবে। ধনী স্বাস্থ্যবানেরা নয়। কিন্তু নিয়ম মানা হয়নি। অথবা নির্দেশ ছিলো সকলেই ভক্ষণ করবে, কিন্তু সঞ্চয় করবে না। এটিও অমান্য করা হলো। ফলতঃ বিরুদ্ধাচারীগণ শূকর ও বানরের আকৃতি প্রাপ্ত হয়ে গেলো....। এসব বর্ণনার ভিন্নতা যাই থাকুক, যতটুকু সামঞ্জস্য আছে, তার সার কথা হচ্ছে, শূন্যলোক থেকে ফেরেশতাগণ খাবারের খাঞ্চা নিয়ে নেমে এলো। সবাই তা প্রত্যক্ষ করলো। হজরত ঈসা মসীহ্ কৃতজ্ঞ চিত্তে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর খাবারের খাঞ্চা খুললেন। সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো– তারা দেখলেন পাঁচটি রুটি, পাঁচটি তাজা খোরমা এবং একটি ভূনা মাছ..।

অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিদান সম্ভব কি?

মানুষ যতই বুদ্ধি বৃত্তিক উন্নতি সাধন করছে, মহান আল্লাহর কুদরতের নিশানা ততই চিন্তাশীল মানুষের সম্মুখে নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।

আল কুরআনে 'খোদায়ী ইতিহাসের শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী' বর্ণনার ধারাবাহিকতায় নবী রসূলদের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। অদৃশ্য জগতের অনেক সত্যকে অতিপ্রাকৃত ভেবে সন্দিগ্ধ না হওয়া এবং নির্দ্বিধায় সেই সত্যকে গ্রহণ করা একজন ইমানদারের সুস্পষ্ট লক্ষণ। ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় আক্রান্ত না হওয়াও আরেকটি লক্ষণ। কারণ ইমানদারীর পথ, সুপ্রশস্ত, সহজ এবং সরল।

'তারা যে কোনো নিদর্শনই দেখুক না কেনো (হঠকারিতা ও গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে) এর প্রতি কখনো ইমান আনবে না'-(সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৬) এ স্থানে স্পষ্টতঃ হুঁশিয়ারী। তবু মানুষ দ্বিধাবিভক্ত কেনো?

মানব জাতিকে হেদায়েতের আলোকে আলোকিত করতে এবং সহজ সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করতে অর্থাৎ পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণকর জীবনের জন্যে পৃথিবীতে নবী ও রসূলগণের আগমন ঘটেছে।

যে যুগে, যে সময়ে যে বিষয়ের গুরুত্ব প্রবহমান ছিলো, সেই সময়ের নবী ও রসূলকে সেই প্রকার বিশেষ বিষয়ে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো। এটা ছিলো আল্লাহ্‌র কুদরতী প্রজ্ঞার সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ, বিশেষ নিদর্শন।

হজরত দাউদ আ. এবং হজরত সুলাইমান আ. পাখির সাথে কথা বলতেন। হজরত সুলাইমান আ.কে বায়ু নিয়ন্ত্রণ, জ্বিন জাতিকে ও পক্ষীকুলকে বশ্যতা করার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালা।

যাদুকরদের যাদু বিদ্যার গুরুত্ব ছিলো হজরত মুসা আ. এর যুগে। ফলতঃ নয়টি প্রকাশ্য মোজেজা প্রদান করা হয়েছিলো হজরত মূসা আ.কে। অলৌকিক লাঠির অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড এবং একটি বিশেষ কৌশলে শুভ্র হাত প্রদর্শন ছিলো নয়টি মোজেজার অন্যতম দু'টি বিরাট নিদর্শন। লোহিত সাগরে ফিরাউনের সলিল সমাধি এবং হজরত মুসা আ. এর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া– স্বতন্ত্র নিদর্শন ছিলো, সন্দেহ নেই।

মহান আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিম আ. এর জন্যে আগুনের সুতীব্র লেলিহান শিখাকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন। হজরত সালেহ আ. এর জাতির জন্যে একটি বিশেষ উষ্ট্রীকে নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে হজরত ঈসা মসীহ্ আ. কে একাধিক মোজেজা প্রদান করা হয়েছিলো। হজরত ঈসা মসীহ আ. এর আবির্ভাব ছিলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিশেষ যুগে। তখন জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্যদান, সর্বোপরি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। অতঃপর খাতিমুল আম্বিয়া সর্বশেষ নবী হজরত মুহম্মদ স.কে বুদ্ধিবৃত্তিক আল কুরআন প্রদান করা হয়েছিলো, যার চ্যালেঞ্জের জবাব কেউ দিতে সক্ষম হয়নি। অনন্তর বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেজা নিঃসন্দেহে বিরাট নিদর্শন।

....'আমরা যদি তাদের প্রতি আসমানের কোনো দরজা খুলে দিতাম, আর তারা প্রকাশ্য দিবালোকে তাতে আরোহণ করতো, তবু তারা এটাই বলতো, আমাদের দৃষ্টিকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।' সূরা হিজরের উদ্ধৃত বাণীটি তাদের দৃষ্টিদান করবে কি?

তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন আলোর বলয়ে.....

বাদশাহ্ হেরোদের রাজ্যপাট ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে আসছিলো। অথচ হজরত ঈসা মসীহ আ. দাঁড়িয়ে ছিলেন আলোর বলয়ের মতো স্থির বিশ্বাসের উপর। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সকল ক্ষমতা ছিলো রোমের পৌত্তলিক বাদশাহ্ কাইজারের করতলে। পিলাত ছিলো তারই প্রতিনিধিত্বকারী শাসনকর্তা। ইহুদীদের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করতো পিলাত।

ইহুদীরা যদিও পৌত্তলিক বাদশাহের কর্তৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলো, তবু আল্লাহ্র নবী হজরত ঈসা মসীহ আ. এর প্রতি ছিলো তাদের জাত আক্রোশ। নবীর প্রতি হিংসাপরায়ণাতায় ও হীনমন্যতায় দীর্ণ হচ্ছিলো তাদের হৃদয়।

আল্লাহ্র নবীকে কোনোরূপ ছাড় দিতে তারা রাজী নয়। কারণ, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে নবীর ভক্তকুল। জনগণের একাংশের মধ্যে নবীর গ্রহণ যোগ্যতা এক পর্যায়ে ঈর্ষণীয় স্তরে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ ঈসা মসীহ দেশের হুকুমত তালুবন্দী

করার বিশেষ কৌশল হিসাবে জনগণকে মোজেজা প্রদর্শন করে মোহাচ্ছন্ন করেই চলেছে, এই প্রতীতি জন্মালো নেতৃস্থানীয় ইহুদী, আহবার এবং অপরাপর যাদুকরগণের মনে।

ফলতঃ রক্তহননের নেশা প্রবল হয়ে উঠলো ওদের। 'জানী-শত্রুকে আর বাড়তে দেয়া নয়' এরকম একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সুদৃঢ় হলো ইহুদীরা। গভর্ণর পিলাত স্পষ্ট ধোঁকায় পতিত হলো– কান কথায়। যীশু গ্রেফতার হলেন।

যোতন ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে ঃ

....'অতঃপর নেতৃবৃন্দ, কাহেন সম্প্রদায় এবং আহবারগণ জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলো, তোমরা কি করিয়াছো? ঐ লোকটি (ঈসা) মানুষকে যাদু দেখাইতেছে। যদি আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে সমস্ত মানুষ তাহার ধোঁকায় পড়িবে এবং রোমানগণ অতি সহজেই আমাদের দেশ দখল করিয়া লইবে। কাইয়ান নামক সর্দার ব্যক্তিটিও অনুরূপ বলিলো..... সবাই মরার চেয়ে একজন মরা কি উত্তম নহে.....? (১১তম অধ্যায় স্তবক ৪৬-৫০)

এদিকে মসীহ ঈসা আ. ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের খবরটি জেনে ফেললেন। তিনি ইহুদীদের কুফরী, অবাধ্যাচরণ, ষড়যন্ত্র সর্বোপরি হননের সুতীব্র নেশা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হয়ে একটা কিছু করার তাগিদে হাওয়ারীদিগকে একত্রিত করলেন এবং একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ভাইসব। তোমরা বনী ইসরাইলদের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের কোনো খবর রাখো কি?

সকলে বাক্যহীন –নীরব।

সকলকে নীরব প্রত্যক্ষ করে তিনি পুনঃ বললেন এখনইতো সময়। এই কঠিনতম পরীক্ষার সময়ে তোমাদের মধ্যে কে কে আছো, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য আমাকে সাহায্য করতে পারো....?

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, আমরা তো লা শরীক আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করি। আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁর রসূলের উপর ইমান এনেছি। অবশ্যই আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বীনের সাহায্যকারী। আপনি সাক্ষী থাকুনঃ আনুগত্যের উপর অবিচল থেকে আমরা বলছি– হে আমাদের রব! আপনার নাযিলকৃত পবিত্র গ্রন্থের উপর এবং আপনার রসূলের উপর নিশ্চয় নিবিড় আনুগত্য মানছি। হে মহান আল্লাহ্‌, আমাদেরকে আপনি সত্য ন্যায়ের জন্যে অকাতরে জীবন প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

একটি নিরিবিলি রুদ্ধদ্বার কক্ষে হাওয়ারীগণ সহ মসীহ ঈসা আ. অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে ইহুদীরা গোপন সূত্রে সেই খবরটি পেয়ে গেলো এবং খুব সতর্কতার সাথে চতুর্দিক থেকে ঘরখানা ঘিরে ফেললো।

গ্রেফতার হলেন মসীহ ঈসা আ.

ইহুদীরা উল্লাসে মাতোয়ারা।

অকথ্য বাক্যবাণ, থুথু নিক্ষেপ, নানাবিধ নির্যাতন করতে করতে তারা হজরত ঈসাকে শাসক পিলাতের দরবারে নিয়ে হাজির করলো।

পিলাত জানতো যে মসীহ ঈসা একজন নিরীহ ব্যক্তি, নিরপরাধ। সে তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায়নি। কিন্তু সভাসদগণের একগুয়েমি, জনতার বিদ্রোহের মুখে বাধ্য হয়েই মসীহ ঈসাকে সিপাহীদের কাছে হস্তান্তর করলো।

মথি লিখিত সুসমাচারের বর্ণনা নিম্নরূপঃ "... ভোর হলে প্রধান যাজকগণ এবং লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিপক্ষে শলা পরামর্শ শুরু করলো এবং তাঁকে বেঁধে দেশাধ্যক্ষ পিলাতের কাছে সমর্পণ করলো। পিলাতের রীতি ছিলো এরকম যে, উৎসবের সময়ে জনগণ যাকে চাইতো, এমন একজন বন্দীকে মুক্তি প্রদান করতো সে। সেই সময়ে একজন প্রসিদ্ধ বন্দী ছিলো কয়েদখানায়, তার নাম ছিলো বারাব্বা। পিলাত বারাব্বাসহ যীশুকে দরবারে হাজির করে জানতে চাইলো, হে লোক সকল! তোমরা কার মুক্তি প্রত্যাশা করো? যীশুখৃষ্টের? না বারাব্বার?

জনতা সমস্বরে বলে উঠলো যীশু নয়, যীশু নয়, আমরা বারাব্বার মুক্তি চাই।

তাহলে যীশুর কি হবে?

তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

তার অপরাধের প্রমাণ কি?

জনতা প্রমাণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলো। পিলাতের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হলো। গোলোযোগ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বুঝতে পেরে পিলাত স্বীয় হস্তদ্বয় ধৌত করে বললো, হে লোক সকল! তোমরা শুনে রাখো, এই মহান ধার্মিক মানুষটির রক্তপাতের জন্যে আমি দায়ী নই, এই অনর্থক রক্তপাতের জন্যে তোমরাই দায়-দায়িত্ব বহন করবে কি? জনতা এসব কথার কোনো জবাব দিলোনা। হৈ চৈ বেড়েই চললো। জনগণের অনড় সিদ্ধান্তে পিলাত বারাব্বারকে মুক্তি দিলো এবং মসীহ ঈসা আ.কে বন্দী অবস্থায় সৈনিকরা চাবুক মারতে মারতে পুনঃদুর্গের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেলো...।

.....হায়রে হৃদয়হীন পাষণ্ডতা!

.....যীশুর পরিধেয় বস্ত্র-বিবস্ত্র করে ফেলেছিলো তারা। পরিবর্তে একটি লোহিত বস্ত্র পরানো হলো। মাথায় তুলে দেয়া হলো কণ্টকিত মুকুট। ডান হাতে এক গাছি শক্ত নল।

তখনো সমানে নবীর প্রতি চলেছে প্রহার, নির্মম পরিহাস! নির্যাতন, ঘৃণ্যবিদ্রূপ। সবাই থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে। তারপর ডান হাতের সেই লোহার নলদণ্ডটি দিয়ে নির্দয় প্রহার চালাতে লাগলো। মথির ইঞ্জিলে আরো বলা হয়েছে, 'এর পরে যীশুকে শূলবিদ্ধ করার জন্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচলিত ইঞ্জিলে সকল সংস্করণেই এ ঘটনার প্রায় একই প্রকার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

....তারা যীশুর হস্তদ্বয় পিছন দিকে বেঁধে কাঠের সঙ্গে পেরেক বিদ্ধ করলো।....নানাবিধ উপহাস ও বাক্যবাণ নিক্ষেপ করলো....দ্বিপ্রহর থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত লাগাতার দিনের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো। তৃতীয় প্রহরে যীশু চিৎকার করে বললেন এলী! এলী! লামা সাবাকতানি – প্রভু! প্রভু হে! তুমি কেনো আমাকে পরিত্যাগ করলে.....?

যোহন বর্ণনা করছে– "যখন তারা যীশুর নিকটে এসে দেখলো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন একজন সৈনিক বর্শা দিয়ে তাঁর পাঁজর বিদ্ধ করলো এবং পাঁজর থেকে রক্ত ও পানি অবিরত ধারায় ঝরতে থাকলো....."

এরপর নীকদীম এলো সুগন্ধির পশরা নিয়ে তারা মৃতদেহে সুগন্ধি মাখিয়ে মসীনার বস্ত্রে কফিন পরালো এবং কাছেই ছিলো একটি উদ্যান, সেই উদ্যানের মধ্যে একটি নতুন কবর খনন করা হয়েছিলো। তারা যীশুকে সেই কবরে সমাহিত করলো।

এই বর্ণনা পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। প্রকৃত ঘটনা তো এরূপ ছিলো না। মহাপবিত্র আলকুরআন বিজ্ঞানময়। কোরআনুল করিম হজরত ঈসা মসীহ আ. এর শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।

.....তাঁহাকে (ঈসাকে) শূলবিদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে জীবিতবস্থায়ই আসমানে তুলিয়া নিয়াছেন...? (আলকুরআন) অর্থাৎ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আলোর বলয়ে।

তারা কারা, যারা কুফরী করেছে?

'যীশুকে শূলবিদ্ধ করার মনগড়া বিশ্বাসের বিপক্ষে আল কুরআনের বুদ্ধি বৃত্তিক ঘোষণা কি?

'চার পাশে যখন শত্রুরা বেষ্টনী রচনা করেছে। বনী ইসরাইলদের সর্দার 'সেয়উগ' হজরত ঈসা মসীহ আ. কে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও নবীকে পেলো না সে। তিনি কোথায় ছিলেন?

তার সুস্পষ্ট জবাব পাই কুরআনুল হাকীমের বর্ণনায়– "হে ঈসা! এটা আমারই দায়িত্ব যে, আমি তোমার জন্য নির্ধারিত জীবনকাল পূর্ণ করবো।" অর্থাৎ (তুমি নিশ্চিত থাকো যে, শত্রুরা তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। ঐ সময় আমি তোমাকে আমার কাছে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নিয়ে আসবো.... বরং তোমাকে শত্রুদের নিকৃষ্ট হাত থেকে সার্বিকভাবে হেফাজত করা হবে। কোনো শত্রুই তোমার নাগাল পাবে না"....। (কাসাসুল কুরআন)

কার্যতঃ আল্লাহ্তায়ালার আদেশে জ্যোতির্ময় বার্তাবাহক পুরুষ, জিব্রিল আমীন ওহী নিয়ে এলেন এবং বিশেষ কৌশলে হজরত ঈসা মসীহ আ. কে ঊর্ধ্ব জগতে উত্তোলন করে নিলেন।

পবিত্র আল কুরআন এ সম্পর্কে অন্যত্র সুস্পষ্ট তথ্য দিয়েছেঃ "এবং (ইহুদীদের অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হলো) তাদের এই কথার উপর যে, আমরা– মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি কিংবা শূলবিদ্ধও করতে পারেনি বরং আল্লাহ্তায়ালার গোপন ব্যবস্থাপনার কৌশলে প্রকৃত ঘটনাটি তাদের কাছে গোলক ধাঁধায় পরিণত করে দেয়া হয়েছে। আর সেই সকল লোক এই বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, মূলতঃ তারা সন্দেহে পড়ে গেছে। আসলে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে জ্ঞান নেই। আছে কেবল অমূলক, বিভ্রান্তিকর ধারণা এবং অন্ধ অনুসরণ। তারা নিশ্চয় মসীহ ঈসাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ্তায়ালা ঊর্ধ্বজগতে তাকে উত্তোলন করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা সফলকাম এবং মহাজ্ঞানী"...। (কাসাসুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড)।

মূল ঘটনাটি অন্য রকম।

আল্লাহ্তায়ালার কুদরতে সেয়উগের চেহারা অবিকল মসীহ্ ঈসা আ. এর চেহারার মতো হয়ে গেলো। ফলে সেয়উগকে লোকেরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো।

ঊর্ধ্বজগত কি?

শূন্যলোক আসমান?

হ্যাঁ, ঊর্ধ্বজগতেই সপ্ত আসমান বিদ্যমান।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার আরশ কুরছী, লাওহে মাহফুজ, ছিদরাতুল মুনতাহা এবং আরো অজানা রহস্যময় জগতসমূহ সেখানে বিদ্যমান।

বোখারী শরীফের বর্ণনা মতে– সেখানেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালার সুবিশাল কর্মীবাহিনী তথা ফেরেশতাগণ বিভিন্নভাবে কর্মে নিয়োজিত আছেন। ভূমণ্ডলের পরিচালন-কার্য-বিধি সেইখান থেকেই পরিচালিত হয়।

কাসাসুল কুরআনের ভাষ্যে বলা হয়েছে 'হজরত মসীহ ঈসা আ. এরপর থেকে সেণ্ট পলের পূর্ব পর্যন্ত খৃস্টান জগত ইহুদীদের এই কল্পিত কাহিনীর সাথে

সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন ছিলো। সেন্ট পল যখন ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তের ধারণার উপর আধুনিক খৃস্টবাদের ভিত্তিস্থাপন করেন, তখন প্রায়শ্চিত্তের ধারণাটিকে সুদৃঢ় করার মানসে ইহুদীদের এই কল্প-উপাখ্যানটিকে তারা ধর্মের অংশে পরিণত করে নেয়।'

অন্যদিকে বিজ্ঞানময় আল কুরআন যখন চৌদ্দ শত বছরের সুদীর্ঘসময়ে হজরত ঈসা মসীহ আ. এর মহান মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, অপার মহিমার কথা ঘোষণা করে এবং তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে উত্তোলন করার রহস্যটিকে ইহুদী খৃস্টানদের কল্পকাহিনীর বিপরীতে জোরালো এবং নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করায়, তখন মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার গোলাম আহমদ, মার্ক হ্যানা ও হামরান আমব্রী এই সত্যটিকে অস্বীকার করে জোরেশোরে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে মাত্র।

খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারী, নবুয়তের ভণ্ড দাবীদার, গোলাম আহমদ কাদিয়ানি পবিত্র কুরআন মজীদের বর্ণনাকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছে। 'নিঃসন্দেহে ইহুদীরা হজরত ঈসা মসীহকে বন্দী করে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে করতে প্রহার করতে থাকে। মস্তকে কণ্টকের টুপি পরিয়ে মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করে এবং এভাবে যাবতীয় উপায়ে অপদস্থ করার পর তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে....। এই হলো গোলাম আহমদের অপবিজ্ঞান।

মার্ক হ্যানা তার 'সত্যের সন্ধানে' পুস্তকে অভিযোগ করেছে, কোরআন শরীফে নাজাতের আশ্বাস সম্বলিত একটি শব্দও দেখতে পাওয়া যায় না..।

কি জঘন্য মিথ্যাচার!

....."হাক্কান আলাইনা। নুনজিল মুমিনীন"- "মুমিনদের নাজাত আমার উপর হক" (১০ঃ১১০)। সকল অনাচারী জঘন্য পাপীদেরকে এরকম আরো আশ্বাসবাণী কি শোনাননি মহান আল্লাহ্তায়ালা...."ওহে! যারা নিজেদের উপর অনাচার করেছো, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন"।

বিভ্রান্ত ইসলাম ত্যাগী এরকম আরেকজন হামরান আমব্রী।

হামরান আমব্রী তার 'আল্লাহ্ আমার জন্য ব্যবস্থা করেছে অনন্ত জীবন' গ্রন্থে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "আল্লাহ্ সম্পর্কিত ত্রিত্ববাদ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ 'পিতা' রূপে আখ্যায়িত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্–বিশ্বের স্রষ্টা, যা ইসলামে 'পরাক্রমশালী' অর্থে আল-কাদির শব্দের সদৃশ।

তাঁর কালাম, যাকে 'পুত্র' নামেও আখ্যা দেয়া হয়, ঈসার জন্মে মানব রূপ পরিগ্রহ করেছিলো আল্লাহ্র বিধিসমূহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য, মানুষের কাছে আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করার জন্য, মানবিক ভাষায় কথা বলার জন্য তিনি ছিলেন আল্লাহ্র জীবন্ত কালাম....। অর্থাৎ যীশু ছিলেন 'ইবনুল্লাহ'।

তাহলে কি দাঁড়ালো? যথাপূর্বং তথা পরং।

এরকম আত্মঘাতী স্বীকারোক্তির গুহায় প্রবেশের হেতু আমব্রী নিজেও কি জানে? এই বিকৃতির পরিণাম আর যাই হোক, সুখকর নয়। তাদের কাছে হজরত ঈসা মসীহর আ. নবীসত্তা অপেক্ষা ইবনুল্লাহ্ সত্তা কেনো গ্রহণযোগ্য হলো? এর পেছনে রহস্য কি? কাদিয়ানের গোলাম আহমদ, মার্ক হ্যানা এবং হামরান আমব্রীর আত্মকথনে মহান আল্লাহ্র সেই হুঁশিয়ারী সতর্ক উচ্চারণটি সঙ্গত কারণেই মনে পড়বে...."তারা কারা, যারা কুফরী করেছে"?

ত্রিত্ববাদ কি?

ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস মূলতঃ শিরকবাদী দর্শন। পৌত্তলিকতা প্রসূত অবতারবাদের প্রতিধ্বনিমাত্র। এই প্রতীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে মহান আল্লাহ্তায়ালার জাতি সত্তা এবং সিফাতসমূহ মাবনরূপ ধারণ পূর্বক সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মূলতঃ ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস খৃস্টবাদ এবং পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণজাত। (কাসাসুল কুরআন)।

আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, তাঁর কাসাসুল কুরআনে এভাবে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম লিখেছেন, 'স্কান্দারিয়ার পৌত্তলিক দার্শনিক মতবাদ 'সিরাপিস' থেকে ত্রিত্ববাদের ঐক্যের মূল সূর গৃহীত হয়েছে এবং ইজীজ এর স্থান হজরত মরিয়ম আ.কে এবং হোরস এর স্থান হজরত মসীহ আ.কে প্রদান করা হয়েছে।

মিসর এবং গ্রীসের এই পৌত্তলিক দর্শনের কল্যাণে খৃস্টবাদে 'মসীহর প্রভুত্ব' ও ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস গীর্জাসমূহে স্বীকৃত হয়।

নিকাদ কাউন্সিলে, প্রাচ্যের অন্যান্য গীর্জাসমূহে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তখন বিতর্ক চলছিলো এবং তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ত্রিত্ববাদ সত্য, আর ত্রিত্ববাদের বিরোধিতাকারী নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ

ইতোমধ্যে ইবীউনীনরা বিদ্রোহী ফেরকা হিসেবে চিহ্নিত তাদের কাছে। ইবীউনীনদের মতে, হজরত ঈসা মসীহ মানুষ মাত্র ছিলেন।

দ্বিতীয় ফেরকা ছিলো সাবিলীয়ীনরা। তাদের মতে আল্লাহ্‌র সত্তা এক ও অদ্বিতীয়। এক্ষণে 'পুত্র' 'পবিত্র আত্মা' তাঁর বিভিন্ন স্বরূপ মাত্র। তাদের ধারণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র জন্যেই এই শব্দগুলো চয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় ফেরকা আরিউসীয়ীনের ধারণা, যীশু যদিও আল্লাহ্‌র পুত্র, কিন্তু পিতার ন্যায় তিনি চিরস্থায়ী বা চিরঞ্জীব নন, বরং বিশাল ও ক্ষুদ্র বিশ্বের পূর্বে পিতা কর্তৃক তিনি সৃষ্ট। সে কারণে পিতার তুলনায় পুত্রের মর্যাদা স্বল্পতাহেতু পরাজিত ও বিনীত।

চতুর্থ ফেরকা মাকদুনীয়ীনদের মতে 'পিতা' ও 'পুত্র' দুজনই আদি ও আসল। পবিত্র আত্মা আদি ও আসল নয় বরং সৃষ্টি।

বিভিন্ন ফেরকার বিভিন্ন ধারণাকে নীকাদ কাউন্সিল কনোস্টান্টিনোপলের সম্মেলনে বাতিল করে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'পিতা', 'পুত্র' ও পবিত্র আত্মা তিনজনই পৃথক মৌল সত্তা।

আলমে লাহূতে– তিনের এককত্বই হলেন আল্লাহ্‌। অর্থাৎ 'তিনই এক' এবং 'একই তিন।'

তলীতলা সম্মেলন এই সংশোধনবাদকে অনুমোদন করলেও আরো একটু যোগ করলো– পবিত্র আত্মার প্রকাশ শুধুমাত্র পিতা থেকেই হয়নি, বরং, 'পিতা-পুত্র' উভয় থেকে উদ্ভূত। ল্যাটিন গির্জাসমূহ নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তটিকে মেনে নেয়। গ্রীসীয় গির্জা প্রথম দিকে নীরবতা পালন করলেও এই সংশোধনকে বিদআত ঘোষণা করে। ফলতঃ গ্রীসীয় গীর্জা এবং ল্যাতিন গীর্জার মধ্যে কখনো ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে লাহূতী ফেরকার অধিকাংশ এবং আরো কিছু ভুঁইফোঁড় নতুন গজানো ফেরকা ত্রিত্ববাদের এই বিশ্বাসকে বুদ্ধি নির্ভর বা ঐশীবাণী নয় বলে ঘোষণা দেয়। অর্থাৎ এসব কিছুই ছিলো পৌত্তলিক দর্শনের অবদান।

আসলে ত্রিত্ববাদ কি? পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার রহস্যই বা কি? নিজেদের কাছেই অস্পষ্ট থাকায় বিভিন্ন মতবাদের ধারণাটিকে নিজেদের কাছে অধিকতর জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, স্বতন্ত্র প্রাচ্যের গির্জাসমূহও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং এটিকে খৃস্টবাদের জীবনীশক্তি মনে করে।

ক্যান্ট একটু চাতুরী করে বলেছেন, ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস মানে এই নয় যে– পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা, বরং আলমে লাহূতে মহান আল্লাহ্‌র তিনটি মৌলিক সিফাতের ইঙ্গিতমাত্র, যা অন্যান্য গুণাবলীর উৎস এবং ভিত্তিস্থলের মর্যাদা রাখে। এবং তা হলে কুদরাত (পিতা) হিকমাত (পুত্র) ও ভালোবাসা (আত্মা) অথবা

আল্লাহ্‌র তিনটি কাজের ইঙ্গিতবাহী সিফাত যা সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নামেও ব্যাখ্যা করা যায়।

হেশিং ও শীলিংও এই চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন।

বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়, লুথারাশ সম্প্রদায় এবং একত্ববাদী সম্প্রদায় জামানীঈন সম্প্রদায় ছাড়াও আরো অনেক সম্প্রদায় আছে, যারা সাবীলিঈনদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে আরেকটি বিশাল ফেরকা গঠন করেছে। এই আকীদা শিরক প্রসূত এবং তৌহিদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তা-বলাই বাহুল্য।

মোদ্দাকথা, ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের মধ্যে তিনটি প্রত্যয় অটুট ছিলো।

একদলের মতে মসীহ-ই-প্রকৃত খোদা। খোদা-ই-মসীহ রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে।

দ্বিতীয় দলের ধারণা মসীহ খোদার পুত্র।

তৃতীয় দলের অভিমত, একত্বের রহস্য তিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে অর্থাৎ পিতা-পুত্র-মরিয়ম। এদের মধ্যেও আবার দুই ভাগ। দ্বিতীয় দলের লোকেরা মরিয়মের বদলে পবিত্র আত্মাকে তৃতীয় আকনুম (আসল) হিসেবে প্রত্যয় করতো। শেষ মেষ কি দাঁড়ালো? থোড় বড়ি-খাড়া। খাড়া বড়ি-থোড় এবং এই পরস্পর বিরোধী জগা-খিচুড়ির নামই কি ত্রিত্ববাদ নয়?

....এবং পৌল ও তাঁর ইবনুল্লাহর ধারণা।

পৌল কে?

ডঃ বুকাইলী লিখেছেনঃ 'বস্তুতঃ পৌল হচ্ছেন খৃস্ট ধর্মের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। যীশুখৃস্টের পরিবারের সদস্যদের নিকটতো বটেই, যীশুর যেসব সংগী সাথী জেরুজালেমে জেমসের সঙ্গে ছিলেন, পৌল তাঁদের নিকটেও যীশুর চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। আসলে যীশুখৃস্ট যেসব লোককে তার ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত নিজের নিকট জড়ো করেছিলেন, তাঁদের বর্জন করেই পৌল আলাদা খৃস্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। যীশুর জীবদ্দশায় যীশুর সাথে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটেনি, (দি বাইবেল দি কোরআন এ্যাণ্ড সায়েন্স, পৃঃ ৯৭)

পৌলের এই পরিচিতিতে 'তিনি যে সাহাবা পর্যায়ভুক্ত', একথা আদৌ স্বীকৃত নয়। 'যীশুর সাথে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটেনি'। এই উক্তিটিও অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

তিনি যে সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন এবং যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন, এই উক্তি দ্বারাই তার স্বতন্ত্র সৃষ্ট মতবাদটির বিশ্বাসযোগ্যতাও হারায়।

মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন তাঁর 'মসীহী মতবাদ নিয়ে কিছুকথা' নিবন্ধে তথ্য-নির্ভর যুক্তি দেখিয়েছেন–

'জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিলো শুরুতে। হামরান আমব্রীর ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা পাঠ করেই ধাঁধাঁ আরো জট পাকিয়ে যায়।

ঈসা মসীহ যদি 'ইবনুল্লাহ' হবেন 'পিতা আল্লাহ্‌র' সাথে এক সত্তা হবেন, তাহলে তিনি হজরত মোহাম্মদ স.কে শেষ নবী করে প্রেরণ কালে এবং তেইশ বছর যাবত কালে কেনো আল্লাহ্‌র উপর 'ইবনুল্লাহ' সত্তার প্রভাব খাটাননি? তার ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যুর অস্বীকৃতিসহ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ কালেও তিনি নিষ্ক্রিয় নীরব ভূমিকা পালন করলেন, কেনো? তিনি কি এমন ব্যর্থ ইবনুল্লাহ ছিলেন?

হজরত ঈসা মসীহ আ. এর প্রতি কোনো প্রকার অশ্রদ্ধা, কোনো মুসলমানই পোষণ করে না। এবং অশ্রদ্ধার প্রশ্নও ওঠে না। বরং আল্লাহর নবী হিসেবে তাঁর মুসলমানদের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির কমতি নেই। কথা উঠেছে তাঁর সম্পর্কে কল্পিত ইবনুল্লাহ্‌ সত্তা নিয়ে। যার অস্তিত্বটাই স্বীকৃত নয়। হামরান আমব্রীর লিখিত ব্যাখ্যা মতেই মসীহীবাদ উপরোল্লিখিত প্রশ্ন জালে আটকা পড়ে যায়। সুসমাচার লেখকরা ও সেন্ট পৌল ঈসা মসীহ আ.কে যতই 'ইবনুল্লাহ' বলুক– মসীহীবাদের আকীদায় যা কিছু কাল্পনিক, অবৈধ, ক্লেদাক্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, তার অবমুক্তি না হলে হজরত 'ঈসা রুহুল্লাহর' প্রকৃত ধর্মমতটি স্বরূপে ফিরে আসতে পারে না।

খৃস্টান গীর্জা পরিষদ এবং পৌল মতবাদ কি আদৌ এতে প্রস্তুত হবেন? তাদের 'প্রভু' যীশুর 'ইবনুল্লাহ' সত্তা অপনোদন করতে তারা রাজী হবেন? প্রস্তুত হবেন যীশুর নাজাতের মৃত্যুর ধারণা ত্যাগ করতে? এবং তা পারলে তো ইসলামের সঙ্গে মসীহীদের 'বিরোধ-এলাকা' আর থাকে না'।

ইসলাম শুধুমাত্র স্বীয় নবী-রসূলকে নয়, অন্য সকল নবী ও রসূলকে, আসমানী কিতাবসমূহকে, ফেরেশতাবৃন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে এবং এটিও একজন খাঁটি মুসলমানের ইমানী আকিদার অংশ। শিরক বা অংশীবাদীত্বের গুনাহ্‌ যে আল্লাহ্‌তায়ালা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করেন না, এ বিষয়ও আল কুরআনে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে।

অতএব আল কুরআনসূত্রে প্রচলিত মসীহীবাদের আকীদা 'ত্রিত্ববাদ' যে একটি নির্ভেজাল শিরক, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং একজন উলুল আজম রসূলকে নিয়ে শিরকের দিব্য অনুষ্ঠান যে কোনো খাঁটি মুসলমানদের ইমানী বিশ্বাসকে বিদ্ধ করবে বৈকি?

পৌলের দাবীমতে– তিনি দামেস্কের রাস্তায় যীশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। অলৌকিকভাবে যীশু অবতরণ করে পৌলকে অনেক নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, যা তার 'মসীহীবাদের সার বস্তু' 'ইবনুল্লাহর' ধারণাটিকে আদৌ সুদৃঢ় করে না।

কিন্তু আল কুরআনে শেষ নবী স. কে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাদেশ প্রদত্ত হয়েছেঃ

"বলো, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোনো পুত্র থাকিলে আমি তাঁহারই ইবাদতে আগ্রহী হইতাম"....

এতদসত্ত্বেও পৌলের 'ইবনুল্লাহর' ধারণাটি যদি না পাল্টে নেয়, তাহলে আহমদ দীদাতের উক্তিটিই প্রণিধানযোগ্য হবে,..... 'কে তার ভেঁড়াগুলো হারাতে চাইবে'?

খ্রীস্ট ধর্ম কি?

মসীহীবাদীদের মতে, 'যে ধর্ম আপন বুনিয়াদকে নাসেরার অধিবাসী যীশুর দিকে সম্পৃক্ত করে এবং যে আচার-অনুষ্ঠান, ইতিহাস-ঐতিহ্য পাপাচারের শৃংখল মুক্তির প্রত্যয়স্থাপক; যেখানে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের একমাত্র সম্পর্ক যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তকরণ আর এ কারণেই মনুষ্য আকৃতিতে যীশুর একটি মতাদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন।'

আলফ্রেড গাওয়ার, মার্করিয়েলটন, আগস্টাইন, নাইট ফ্রেক্সেজ, কালিসটাস, জেফারনাম প্রভৃতি দার্শনিক ও ধর্মীয় নেতাগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যদিও তাদের দল ও মতের ভিন্নতা আছে। আছে পরস্পর দ্বিধা বিভক্তি, তবু মূল মতাদর্শে মোটামুটি বক্তব্য তাদের একই।

দার্শনিকগণ একত্ববাদ কিংবা ত্রিত্ববাদের সমস্যা সমাধান করতে পারেননি। বরং অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য যুক্তির অবতারণা ফেঁদেছেন মাত্র। এক্ষেত্রে আল কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যঃ "তারা বলে, আল্লাহ্‌ কাউকে সন্তান রূপে গ্রহণ করেছেন।

মূলত এই কথার পংকিলতা থেকে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র জিনিসই আল্লাহ্র মালিকানাধীন, সবই তাঁর অনুগত।" (সুরা বাকারাঃ ১১৬)

রোমান ক্যাথলিক চার্চ নেতৃবৃন্দ সমস্যাটির কীভাবে মোকাবিলা করেছেন? এখন সেটি দেখা যাক–

রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যারা এর গিঁট খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তাঁরাই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা বলেন, 'ত্রিত্ববাদে একত্ববাদ অথবা একত্ববাদে ত্রিত্ববাদ, যা এক দুর্ভেদ্য ও রহস্যময় বিষয়; যা অতি গোপন, এবং আমাদের বোধেরও বাইরে...।'

খুবই চাতুরীপূর্ণ উক্তি সন্দেহ নেই।

জনৈক পাদ্রী সাহেব প্রমাণ করতে চাইলেন যে, 'মানুষের শরীরের মতই মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব তিনটি প্রধান অংশ সমন্বয়ে গঠিত। তিনি বলেন, ত্রিত্ববাদ মানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ। তিনটি পৃথক মহাত্মগণের সমাবেশেই খোদার অস্তিত্ব লাভ হয়েছে'। কিন্তু অধুনা প্রচলিত খৃস্টধর্মে তিন খোদাকে 'পৃথক তিনটি অংশ' মানা হচ্ছে না, বরং তিনটি পৃথক সত্তা গণ্য করা হয়।

তাহলে কি দাঁড়ালো? ঐ একই কথা। যথা পূর্বং তথা পরং।

এটুকু জানার পর অগ্রসর হওয়া বড়ই কষ্টকর। এই ধর্মে খোদায়িত্বের ধারণা খুবই বিভ্রান্তিকর এবং দুর্বোধ্য। অবশ্য একথা সর্বজন বিদিত যে, 'পিতা', 'পুত্র' ও 'পবিত্র আত্মার' বিশ্বাস ও বিশ্লেষণ এবং খৃস্টান পণ্ডিতবর্গের ব্যাখ্যা চরম মতবিরোধপূর্ণ হওয়ায়, তাঁদের পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করাও সুকঠিন।

একদলের মতে যীশুকে শূলীতে চড়ানোর সাথে সাথে খৃস্ট ধর্মে বিশ্বাসী সকল মানবকে অস্থায়ী পাপ পংকিলতা থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে। পাপের কারণ হিসেবে তারা আদি পিতা হজরত আদম আ. এর ভুলের জন্যে মানুষের না কি 'পাপ স্বভাবজাত' হয়ে পড়েছিলো এবং চারটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাঁদের এই বিশ্বাস।

মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী র. লিখিত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'এযহারে হক' এর বিষয়বস্তু অবলম্বনে জনাব শফিউল্লাহ বর্ণিত প্রচলিত খৃস্ট ধর্ম কি? মদীনার নিবন্ধে উপরোক্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, এই চারটি বুনিয়াদ ছিলো ঃ-

১. অবতারবাদে বিশ্বাস
২. ক্রুশারোহণে বিশ্বাস
৩. পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস
৪. 'যীশু খৃষ্ট কর্তৃক পাপীদের উদ্ধার এ বিশ্বাস। অর্থাৎ খৃস্টধর্ম বিশ্বাসে ঈসা মসীহ আ. এর স্থান নির্ণয়ে তারা এভাবে ব্যাখ্যা দান করেছেন।

প্রথমতঃ অবতারবাদে বিশ্বাসঃ বিষয়টিতে মানবাকৃতি ধারণ করে খোদায়ী সত্তার অবতরণে বিশ্বাসের বিষয়টি সর্বপ্রথম ইউহান্নার বাইবেলে লক্ষ্য করা যায়। এই বাইবেলে যীশুর প্রাথমিক জীবনের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করেছেঃ 'প্রথমে কালাম ছিল, কালাম খোদার সাথে ছিলো, কালাম স্বয়ং খোদা ছিলো এবং প্রথমে তা খোদার নিকট ছিলো" কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে ইউহান্না আরো লেখেন, 'এবং কালাম শারীরিক আকৃতিতে পরিবর্তিত হলো, বরকতময় ও সত্যের অনুসারী হয়ে আমাদের সাথে অবস্থান করলো। আমি তাঁকে তেমনই মহিমান্বিত দেখেছি যেমনটি পিতার একমাত্র সন্তানের মহিমা'।

মার্ক রিয়েলটন এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, 'ক্যাথলিক আকীদা এটাই যে, 'তিনি খোদা ছিলেন; খোদায়ী রঙ ধারণ করে মানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন'....।

আগস্টাইন লেখেন, উপরোক্ত কথাটির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, তিনি খোদায়ী রঙে রঙিন হয়ে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আর মানবীয় বৈশিষ্ট্য স্বয়ং তিনিও সৃষ্টি হয়েছেন....যীশু খোদায়ী বৈশিষ্ট্যে স্বয়ং নিজের থেকে উত্তম আবার মানবীয় বৈশিষ্ট্যে নিজ থেকে ক্ষুদ্র.....।

এক্ষণে প্রশ্ন হলো, একই ব্যক্তিত্ব কীভাবে যুগপৎ খোদা ও মানুষ হতে পারেন? কীভাবে হতে পারেন সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি?

দ্বিতীয়তঃ অবতারবাদে বিশ্বাসী খৃস্টান পণ্ডিতগণ বিভিন্ন যুক্তি, কিছু দৃষ্টান্ত উপমা উপস্থাপন করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন- 'যুগপৎ খোদা এবং মানব এর দৃষ্টান্ত হলো- আংটিতে খোদিত নকশা। কেউ আবার বলেছেন..... এর দৃষ্টান্ত আয়নাতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব স্বরূপ। নকশা করা আংটিতে দু'টি বিষয় প্রতিভাত হয়– আংটি এবং খোদিত নকশা। অপরদিকে আয়না এবং প্রতিবিম্বের মধ্যেও দু'টি অস্তিত্ব বিদ্যমান। আয়না ও প্রতিবিম্ব। অনুরূপভাবে খোদার পুত্র যীশু মানব অস্তিত্বে বিকাশ লাভ করায় তাঁর সত্তায় একই সঙ্গে দুটি বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত। একটি খোদায়ী বৈশিষ্ট্য অন্যটি মানবীয়।

এ জাতীয় প্রবচনকে অধিকাংশ খৃস্টান পণ্ডিতগণ আবার পাত্তা দেননি। ফলে হালে পানি না পেয়ে তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে 'যীশুখৃস্ট'কে ইহুদী প্যাণ্টাস প্লাথস এর নির্দেশে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে; এই বিশ্বাসটিও ধোঁপে টেকেনি। কারণ সেখানেও তাদের মধ্যে বিতর্ক আছে। নিজেদের দল উপদলের মধ্যে তারা একমত হতে পারেনি।

তৃতীয় বিশ্বাস পুনরুজ্জীবনঃ বলা হয়েছে, মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ভক্তদের প্রয়োজনীয় হেদায়েত বাণী শুনিয়ে তিনি স্বর্গে চলে যান।

চতুর্থতঃ পাপের শৃংখলমুক্তিতে বিশ্বাসটি স্ববিরোধী। জনৈক আলিস যা অভিমত দিয়েছে, অন্যরা তার সমালোচনা করেছে। ফলশ্রুতিতে কি দাঁড়ালো? স্ববিরোধ, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সমষ্টিকে কি খৃস্ট ধর্ম বলতে হবে?

ক্রুশিফিকেশানঃ একটি ভ্রান্তধারণা

মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহকে নমরুদের কাফের বাহিনী সুবিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো।

হজরত ইব্রাহিম আ. মহাঅগ্নিপরীক্ষায় ধৈর্য, স্থৈর্যের সীমাহীন দৃষ্টান্ত নিয়ে অটল পাহাড়ের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে স্থির উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ফেরেশতাবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েও কোনো সাহায্যের প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু কেনো? কেনো তিনি নির্মোহ ছিলেন? কারণ একটাই–

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় তিনি ইচ্ছাবান ছিলেন।

আল্লাহ্ তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকে আদেশ করলেনঃ "হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহিমের উপর শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও" ..... তীব্র লেলিহান অগ্নিকুণ্ড ইব্রাহিম খলীলুল্লাহর কেশাগ্র স্পর্শ করলো না...। কিন্তু তথাকথিত ইবনুল্লাহর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই?

মথিলিখিত ইঞ্জীলে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সকাতর উক্তি কি যীশুকে দুর্বলচিত্ত, অসহায় খোদা হিসেবে চিহ্নিত করেনি? তিনি নাকি আর্তনাদে বলেছেনঃ ইলী! ইলী! লামা সাবাকতানি'? প্রভু! প্রভুহে! তুমি কেনো আমাকে পরিত্যাগ করলে?" এই সকাতর উক্তির মাধ্যমে তথাকথিত ইবনুল্লাহ্ কোথায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে? পণ্ডিতগণ একবারও কি তা ভেবে দেখেছেন?

অথচ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যঃ "তাহারা তাঁহাকে (ঈসাকে) হত্যা করে নাই এবং ক্রুশবিদ্ধও করে নাই, বরং তাহাদের কাছে এইরূপ মনে হইয়াছিলো, যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলো, তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত ছিলো, এ সম্বন্ধে অনুমান ব্যতীত তাহাদের কোনো জ্ঞানই ছিলো না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, বরং আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (৫ঃ১৫৭-১৫৮) (কাসাসুল কুরআন)

পবিত্র কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট ভাষ্যে খৃস্টবাদীগণ ওহীর ধারক আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব ও সর্বশেষ নবী স. এর উপর অকারণ এবং যুক্তিহীনভাবে বিদ্বিষ্ট হয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআনের এই তথ্য-ভাষ্যটি তাদের ধর্মের ভিতকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে শুধু দেয়নি, ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

আসলে 'আকৃতিবদল দ্বারা' অন্য আরেকটি মানুষকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিলো, তার বর্ণনা আমরা পেয়েছি সেন্টবার্নবাসের সুসমাচারে। তিনি এই তথ্য দেন যে, 'যীশুর বিশ্বাসঘাতক শিষ্য য়িহুদা ইস্কারিয়োত, তার পাপের পরিণতিতে যীশুর রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইহুদীরা তাকেই ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিলো.....।

সেন্ট আইরেনাস নামক আরেকজন বর্ণনাকারী অন্যকথা বলেন, "যীশুর পরিবর্তে তাঁর ক্রুশকাষ্ঠ বহনকারী কুরুনীয় শিমোনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো"। এই বর্ণনার কোনটি যে সত্য তাও বলা মুশকিল। পেট্রিপোসিন উপদলের মতে খোদার পুত্রকে শূলে চড়ানো হয়েছিলো এবং অন্যান্য অধিকাংশ উপদলের অভিমত ছিলোঃ খোদার পুত্রকে শূলে চড়ানো হয়নি, তিনি তাদের নিকট খোদা বলে বিবেচিত; বরং এ খোদার পুত্রের মানবীয় আকৃতি সম্পন্ন যীশুকে শূলবিদ্ধ করা হয়। তিনি খোদা ছিলেন না। কোনটা সত্যি? কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে?

আসলে খৃস্টবাদের এই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মোকাবেলায় একমাত্র আল কুরআনই হলো মুহাইমেন।

মুহাইমেন এমন এক শিক্ষাকে বলা হয়ে থাকে, যেখানে 'শরীয়ত এবং কামাল' উভয়ই তার মধ্যে সন্নিবেশিত।

আল্লাহ্‌তায়ালা সূরা মায়েদার দশম রুকুতে ঘোষণা করেন— "হে নবী! এই কিতাব (কুরআন) আপনার উপর সত্য সহকারে নাযিল করিয়াছি, যাহা পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী এবং উহার উপর মুহাইমেন"। অথচ অধুনা ইঞ্জিল সম্পর্কে ইঞ্জিলের কোথাও উচ্চারণ নেই যে, উহা কামাল। একটি গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ীঃ

প্রচলিত ইঞ্জিলে লিখিত "ঈসা মসীহ খোদায়ী দাবী করিয়াছিলো।" কিন্তু পবিত্র কুরআনুল হাকীম এই তথ্য প্রদান করে "যাহারা মরিয়মের পুত্র মসীহকে খোদার পুত্র বলে, তাহারা কাফের"। অর্থাৎ প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত তৌরাত ও ইঞ্জিল প্রকৃত সত্যকে ধারণ করেনি। ফলতঃ বর্ণিত ঘটনাবলী ও আকায়েদসমূহ কুফরী শিরকে পরিপূর্ণ'। কারণ এক সময়ে যে ইঞ্জিলকে খোদার বাণী বলা হতো, পরবর্তীতে সেটিকে মানব রচিত ইঞ্জিল বলে কথিত হচ্ছে। খৃস্টীয়দের হাতে এটি যেনো বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য সিলেবাস। ইচ্ছে মতন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। এদের বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিল চালু আছে। তার মধ্যে পূর্ব দেশীয় কলীছা এক প্রকার।

পশ্চিম দেশীয় কলীছা অন্য প্রকার। পূর্ব দেশীয় অনুসারীগণ পশ্চিম কলীছার ইঞ্জিলকে অস্বীকার করে অর্থাৎ পশ্চিম পূর্বকে অস্বীকার করে।

যুগে যুগে নতুন নতুন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। কিন্তু ফলাফল একই। প্রচলিত ইঞ্জিলের বিভিন্ন অংশকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

অথচ আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত কালাম, শরীয়তের আইন, জীবনব্যবস্থা এই রকমভাবে পরিবর্তনশীল নয়।

আল-কুরআনে মানুষের পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। যা আদৌ যুগের দাবী অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায় না। আল কুরআনে ইনসাফ ও ক্ষমাভিত্তিক শরীয়তের রছমও বিদ্যমান রয়েছে। অথচ ইসলাম ত্যাগী মার্ক হ্যানার স্পর্ধিত উক্তি শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, হৃদয়-মনকে পীড়িত করে।

...'কুরআনে ক্ষমার কোনো আশ্বাস দেয়া হয়নি....? মার্ক হ্যানার এ কথার যুক্তি বা রহস্য কোথায়?

"মন্দের বিনিময়ে মন্দ"-এটা ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত। কিন্তু আবারও বলা হয়েছে- "আর যদি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং ইহার মধ্যেই সংশোধন–সম্ভাবনা থাকে, তবে ক্ষমাকারী সুফল প্রাপ্ত হইবে"। এটা ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত।

"যদি তোমার উপর জুলুম হয়, তবে জুলুম মোতাবেক প্রতিশোধ গ্রহণ করো"। এটা ইনসাফভিত্তিক শরীয়ত। 'কিন্তু যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে ধৈর্যধারীদের জন্য সেটাই উত্তম'। এটা ক্ষমাভিত্তিক শরীয়ত।

ধৈর্য, ক্ষমা, ইনসাফ, এসবই মানবীয় গুণাবলী। এই মানবীয় গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিলো বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ স. এর মহান চরিত্রের মধ্যে। তিনি ছিলেন আদর্শ শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী। মক্কা বিজয়ের পর অত্যাচারী কাফেরদেরকে তিনি তাই কুণ্ঠাহীন বলতে পেরেছিলেন ঃ "...আজ তোমাদের উপর কোনোই অভিযোগ নেই ....."।

তিনি তো ছিলেন আল্লাহর রঙে রঞ্জিত। ক্ষমাই ছিলো তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্য। তাহলে ইসলামে ক্ষমা নেই কোথায়? শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী রসূলের মধ্যে মানুষ উদার ক্ষমামাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছেন। আর শরীয়ত প্রদানকারী আল্লাহ্তায়ালাও কি ক্ষমার আশ্বাস বাণী শোনাননি?

হজরত মূসা আ. ছিলেন জালালী (তেজস্বিতাপূর্ণ) সিফাত যুক্ত। হজরত ঈসা মসীহ আ. এর জিন্দেগী ছিলো জামালী (নম্রতাপূর্ণ) সিফাতযুক্ত। খাতেমূল মুরসালীন হজরত মোহাম্মদ স. এর সিফাত ছিলো কামালী অর্থাৎ সর্বগুণ পূর্ণতাময়। একজন আবেদ, জাহেদ, সুফীর জন্যে তিনি যেমন মহান আদর্শ, একজন ব্যবসায়ীর জন্যও তিনি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তিনি যেমন আদর্শ স্বামী, আদর্শ

পিতা, তেমনি আদর্শ নেতা, আদর্শ শাসক বাদশাহ্। তিনি কি নন? হজরত ঈসা মসীহ আ. নির্দ্বিধায় তাই এমন একজন আদর্শ রসূলের আগমন-বার্তা জাতিকে পূর্বাহ্নেই শুনিয়েছিলেন ঃ "…. তিনি আমার পরেই আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ …." (সূরা সফ)

এবং আল কুরআনে সুস্পষ্ট উচ্চারণে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত রসূলকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঃ "হে মোমেনগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অনুসরণ করো এবং তোমাদের ভেতর যারা নেতৃস্থানীয় তাদের; তারপর তোমাদের ভেতর কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে আল্লাহ্ এবং তার রসূলের নির্দেশ মেনে চলো। কিন্তু হায় হতোস্মি!

সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অবিশ্বাসীরা যখন ঘোষণা করে মসীহকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিলো, আল কুরআন তখনো এই আকীদাকে নাকচ করে দিয়ে সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলেঃ "আসল কথা হচ্ছে, যে জিনিস তাদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি, আর যার পরিণতিও তাদের সামনে আসেনি, তাকে তারা (শুধু আন্দাজ অনুমানে) মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করে অমান্য করেছে। এখন দেখো, এই জালেম লোকদের পরিণাম কি হয়েছে"। (সূরা ইউনুস ঃ ৩৯) অর্থাৎ ক্রুশিফিকেশন নিশ্চয় একটি ভ্রান্ত ধারণা।

আল কুরআন বলেছে

'আল্লাহ্ হতে অবতীর্ণ আরবী ভাষায় শক্তিময়, জ্ঞানময় ও প্রেমময় মহাপবিত্র গ্রন্থই আল কুরআন। কুরআন সৃষ্ট জগতের জন্য মহান আল্লাহ্র শাশ্বত এক স্মারক লিপি। কুরআন অসন্দিগ্ধ, মৌলিক, যুক্তিপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট আল্লাহ্র ঘোষণা নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের প্রতিটি অংশের মধ্যে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। কোনো ধরনের অসামঞ্জস্যতা কিংবা অসরলতা এতে নেই। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা কুরআন দিয়ে পরিচালিত করেন। যাকে ইচ্ছা হেদায়েত প্রদান করেন'।

"বল আল্লাহ্ এক,
সব জিনিসই নির্ভর করে তাঁর ওপর;
তিনি জনক নন।
এং তিনি জাতও নন;
এবং কেউই তাঁর মত নয়"। আল কুরআনের এইতো শ্বাশত উচ্চারণ।

এবং "তিনিই আল্লাহ্, যিনি অবোধ্য, অসীম। তাঁর কোনো বেষ্টন নেই। তিনিই তো স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত সবই সৃষ্ট। সৃষ্ট মাত্রই সসীম। মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং গুণাবলী মানবের দৃষ্টিতে এবং চিন্তা-ধারণায় আসতেই পারে না, তিনি নিরবলম্বন, তিনি বস্তু সাপেক্ষ নন"।

পরম প্রভুর এই চিরন্তন বাণীকে এড়িয়ে চলার অবকাশ নেই। যখনই এর বিরুদ্ধে প্রয়াস চলেছে, তখনই চ্যালেঞ্জ এসেছে— "যদি সমগ্র জ্বিন ও ইনসান সমবেত চেষ্টায় আল কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হয়, তবুও কৃতকার্য হইবে না।" (১৭ঃ৮৮)

এবং "যদি তোমাদের সন্দেহ হয়-এ সম্বন্ধে, যাহা আমি আমার বান্দা মোহাম্মদ এর নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি; তাহা হইলে ইহার সমকক্ষ একটি সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের সাহায্য গ্রহণ করো: কিন্তু কৃতকার্য হইবে না" (২ঃ২৩-২৪)

এটাই আল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার একক অমোঘ ঘোষণা। এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করবে কে? কারও কি হিম্মত আছে?

নিছক বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এই চিরন্তনতাকে উপলব্ধি করা, সত্য পরিজ্ঞাত হওয়া সহজ, কিন্তু সসীম মনের সংকীর্ণতা নিয়ে অসীমকে অনুধাবন কর সত্যি দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে বস্তুজগতের স্বরূপ উদঘাটন করাও কঠিন কাজ। এ হচ্ছে এমন একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া মানবের চিন্তাকে খণ্ডিত করে মাত্র। কারণ প্রকৃত বিশ্বাস নিছক অনুভূতির চেয়েও বড়। অর্থাৎ ধর্মানুভূতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ইমান। সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক হোয়াইট হেড বলেছেনঃ ধর্মের যুগ–যুক্তিবাদের যুগ।

বার্গসত্ত যথার্থই বলেছেন– 'মানুষের সজ্ঞা অন্য কিছু নয়, তা হলো উন্নত ধরনের বুদ্ধি'। একটি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার মধ্যেও আল কুরআনে যে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এক ঐশী প্রেরণার প্রমাণ। উন্নত ধরনের বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয় এখানে নিদর্শন খুঁজে পাবে সন্দেহ নেই।

গ্রীক দর্শন মুসলমানদেরকে প্রথম দিকে আত্মমগ্ন করে রেখেছিলো। আল কুরআন যে মূলতঃ প্রাচীন মতবাদের বিরোধী, মুসলমানদের এই সত্যকে উপলব্ধি করতে বহু বছর সময় লেগেছিলো। শেষ মেষ তাদের মন মননে বিপ্লব এলো।

ক্যাণ্ট আল্লাহ্ সম্বন্ধে মানব জ্ঞানের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী র. ধর্মের স্বাধীন সত্তার সন্ধান পেলেন। তাই তিনি চিন্তার মরু-

সাহরা থেকে মরমীবাদের সবুজ বাগিচায় হিজরত করলেন। তিনি মরমী অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষ করলেন অসীমের রূপ।

আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টি জগতের সঙ্গে মানবের রয়েছে বহুবিধ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে মানবকুলকে গভীরতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে পবিত্র আল কুরআনের মূল উদ্দেশ্য।

কুরআনী শিক্ষার এই মূল দিকদর্শনা লক্ষ্য করে ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ এক আলোচনা প্রসঙ্গে একারম্যান বলেছিলেনঃ "দেখুন, এই শিক্ষা কখনো ব্যর্থ হয় না। আমাদের সকল ব্যবস্থা বিধান দিয়েও আমরা এটাকে অতিক্রম করতে পারি না এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে কোনো মানুষই তা পারে না'।

আল্লাহ্তায়ালা যখন হজরত ঈসা আ.কে দ্বীনে হকের দাওয়াত দেয়ার জন্যে বেছে নিলেন, তখন একদিকে তিনি দলীল (ইঞ্জিল) এবং কৌশল (হেকমত) প্রদান করলেন। অথচ মরুচারী বনী ইসরাইলেরা তখন বিশ্বাসহীনতায় উদাসীন হয়ে থাকলো।

কিন্তু....."বনী ইসরাইলের মাঝ থেকে যে সব লোক কুফরী পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে, কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলো"....(মায়েদাঃ৭৮)

এবং তিনি (ঈসা) কিয়ামতের দিন তাদের (আহলে কিতাব) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন.....(সূরা নিসা ঃ ১৫৯)

আল্লাহ্তায়ালা আল কুরআনের মাধ্যমে ইহুদী খৃস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে "জ্ঞান ও প্রত্যয়ের আলো" প্রদান করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ "বলো! সত্য তোমাদের প্রভুর নিকট থেকেই আসে; অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাসী থাকুক"।

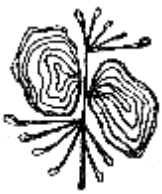

আবার আসবেন তিনি

বস্তুজগত কি মনোজগতেরই প্রতিবিম্ব? হেগেলের বস্তুজগৎ মূলতঃ বস্তু জগতই নয়, সার্বজনীন প্রজ্ঞার প্রকাশ মাত্র। জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট ছিলেন ভাববাদীদের দলে। ভাববাদীদের মতে এই বস্তু জগতের কোনো প্রকৃত সত্তা নেই। মানুষের

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে আর একটা অশরীরী জগৎ আছে, বস্তু জগৎ তারই রূপান্তর মাত্র। হেগেল এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন ডায়লেকটিক ধারণা।

জড়বাদীরা বললেন, ধারণা বলে স্বতন্ত্র কিছুই নেই। বস্তুই আসল সত্য, ভাব নয়। বস্তু হতেই ধারণা– ধারণা হতে বস্তু নয়।

এই জড়বাদের সাথে মার্কস হেগেলের ডায়লেকটিক পদ্ধতি যুক্ত করে বললেনঃ জড় জগতের সবকিছুই ডায়লেকটিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন অবস্থায় একা কোনো ঘটনা ঘটছে না। সমস্ত ধারণাই দ্বন্দ্বমূলক। দ্বিত্বভাবে ঘটছে।

কিন্তু ইসলাম কি বলে?

সবকিছুর মূলে যে শ্বাশত সত্যঃ সবকিছুতে যে একটা দ্বিত্বভাব আছে; ইসলাম তা অস্বীকার করে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলেনঃ "সেই আল্লাহ্র মহিমা, যিনি জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয় এবং যা মানুষ জানে না– এমন সব বস্তুর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন"। এটাই জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে ইসলামের কথা।

বস্তুবাদী দার্শনিকগণ যেরূপ যুক্তিদর্শন বাস্তব উপায় ও স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ খাড়া করে যুক্তি দেখিয়ে গেছেন, ঠিক অন্যরকমভাবে পদ্ধতিগত রীতিতে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, আত্মজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিন্যাসে এলমে লা-দুন্নী বা খোদায়ী জ্ঞান লাভ করেন আল্লাহ্র নবী ও রসূলগণ, আল্লাহ্র ওলীগণ।

সেই আদি পিতা হজরত আদম আ. থেকে মুসলমানজাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ, হজরত মূসা কলিমুল্লাহ, হজরত ঈসা রুহুল্লাহ, আ. এবং সর্বশেষ মহানবী হজরত মোহাম্মদ স. এর মধ্যে এই মহাজ্ঞান এলমে লা-দুন্নী বিদ্যমান ছিলো। এর পরে নায়েবে নবীদের মধ্যে এই 'তাসকিয়া নফসের সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞান' এখনো বহমান। সৃষ্টির গূঢ় রহস্য মানব জীবন সম্পর্কে যে সম্যক ও সত্য জ্ঞান বিস্ময়করভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, সেখানে ঐ জড়বাদী দর্শন পৌঁছাতে অক্ষম।

ইসলাম ইমান, আমলে সালেহ বা সৎকর্মসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানুষ যতই সৃষ্টি ও প্রকৃতির গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, ততই সে নিজের সম্পর্কেও জানতে পারবে। কিন্তু যুক্তিবাদী দার্শনিকগণের স্থূল দৃষ্টিতে সেই জ্ঞান ধরা পড়ে না বিধায় তা অস্বীকার করে।

ইসলামের সর্ব প্রথম বাণীঃ পাঠ করো.... পর্যবেক্ষণ করো, তন্ন তন্ন করে প্রত্যক্ষ করো এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো'। সম্মুখে প্রতিনিয়ত বস্তু, ঘটনা, মানুষ, মতবাদ, সমস্যা। মানুষ নিজেকে অবশ্যই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে। আত্ম দর্শনে সত্য-দর্শন লাভ করবে। নিজেকে চেনার মাঝেই স্রষ্টার পরিচয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ইত্যকার বিষয়ে মন-মননের বিকাশ ঘটানো

ব্যতীত সত্যিকার অর্থে মনের মুক্তি নেই। সেদিকে বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে বরং "সমগ্র সৃষ্টিকুল একমাত্র আল্লাহ্ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত" এই প্রেক্ষিতে হজরত মসীহ ঈসা আ. এর রেসালাত, তাঁর সংগ্রামী জীবন, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত থাকা, আকস্মিক অলৌকিক তিরোধান এবং কিয়ামতের পূর্বাহ্নে এই ধরার পৃথিবীতে পুনঃ আগমন; আমরা এক্ষণে সেই সম্পর্কে তথ্য নির্ভর আলোকপাত করবো।

সহীহ সনদসূত্রে এসেছে–

হজরত হাসান বসরী র. ইহুদী জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 'মসীহ ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন সূরায় আল কুরআনের ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য ...."ইহুদীরা বলে থাকে–উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র। আর খৃস্টবাদীরা বলে, মসীহ আল্লাহ্র পুত্র। এটা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন বাক্য। তারা যা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে– সেই সব লোকদের দেখাদেখি; যারা তাদের পূর্বে কুফরীতে লিপ্ত ছিলো। (আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন) এরা কোথা থেকে ধোঁকায় পড়েছে"? (সুরা তওবা)।

হুযায়ফা রা. বলেন, "আমরা এক মজলিসে বসে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ স. তাঁর প্রকোষ্ঠ থেকে উঁকি দিলেন এবং বললেন মানুষ দশটি আলামত না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না (যেমন পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় হওয়া, তীব্র ধোঁয়া, মৃত্তিকার প্রাণী ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণ, দাজ্জালের আবির্ভাব, তিনটি ভূমি ধ্বস যার একটি প্রাচ্যে, একটি পাশ্চাত্যে, অপরটি আরব উপদ্বীপে এবং সবশেষে এডেন পর্বতের গুহা থেকে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের প্রকাশ, যা লোকদের হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। রাতের বেলা লোকেরা যখন আরাম করবে, তখন তাও থেমে থাকবে এবং দুপুরে যখন আরাম করবে তখন তাও থেমে থাকবে"।

আবু হুরায়রা সূত্রে প্রাপ্ত আরেকটি হাদীস, রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ "তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযিল হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন?"

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন রা. এর সূত্রে অপর হাদীস –

(দাজ্জাল এক মুসলমানের উপর তার শয়তানী তেলেসমাতির পরীক্ষা চালাতে থাকবে) এমন সময় আল্লাহ্তায়ালা মসীহ ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের সন্নিকটে দু'টো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি

টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেনো বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মত চমকাচ্ছে....”। (আবু দাউদ, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

নবী করিম স. বলেনঃ সমস্ত নবীগণ (দ্বীনের মূলনীতিতে) পরস্পর বৈপিত্রেয় ভাই এর মতো। তাদের সবার দ্বীন একই (যদিও শরীয়তের নীতি-পদ্ধতিতে খুঁটিনাটি কিছু পার্থক্য আছে)। আমি অপরাপর নবীদের তুলনায় ঈসা ইবনে মরিয়মের অধিক নিকটবর্তী। কেননা তাঁর ও আমার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো নবী আসেননি। নিঃসন্দেহে তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে নাযিল হবেন। তোমরা তাঁর দেহের গঠন দেখে চিনে নিও। তিনি মাঝারি ধরনের লম্বা হবেন, তাঁর দেহের বর্ণ লাল-সাদায় মেশানো হবে এবং পরিধানে হলুদ রঙের দু'টি কাপড় থাকবে। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেই সিক্ত হবে না। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া লোপ করবেন এবং লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করবেন। তাঁর জামানায় আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত জাতিকে নির্মূল করবেন এবং কেবল ইসলামই বিজয়ীর বেশে টিকে থাকবে। তাঁর হাতেই আল্লাহ্ মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করাবেন। অতঃপর দুনিয়ায় আমানত (বিশ্বস্ততা) কায়েম হবে। এমন কি বাঘকে উটের সাথে, চিতাকে গরুর সাথে এবং নেকড়েকে মেষপালের সাথে বিচরণ করতে দেখা যাবে। শিশুরা খেলা করবে হিংস্র সাপের সাথে, কিন্তু সাপ তাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

তিনি চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যু হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাজা পড়বে।”

তাফসীরকারদের ব্যাখ্যাসূত্রে জানা যায় যে, তখন মুসলমান এবং খৃস্টানদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মাহদী নামে রসূলুল্লাহ স. এর বংশের এক মকবুল বান্দার হাতে চলে আসবে মুসলমানদের নেতৃত্ব এবং ঐ যুদ্ধকালীন সময়েই পথভ্রষ্ট মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জাল হবে ইহুদী বংশদ্ভূত এবং একচক্ষুবিশিষ্ট। কপালে তার খোদিত থাকবে ‘কাফের’ শব্দটি। দাজ্জালের কুহকী কার্যকলাপ হবে প্রতারণা আর ধোঁকাবাজিতে ভরপুর। ইন্দ্রজাল, ভেলকির কলাকৌশলের কারসাজি দেখিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকবে সে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত মসীহ হিসেবে নিজেকে দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে। ফলতঃ অনেক ইহুদী তার অনুসারী হবে।

এমনি দুঃসময়ে প্রত্যুষপ্রহরে, সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদে আজান হতে থাকলে ইমানদার মুসলমানেরা ফজর নামাজ আদায়ে একত্রিত হলে নির্দিষ্ট সময়ে ইকামত হতে থাকবে। প্রতিশ্রুত মাহদী আ. ইমামতি করার জন্যে জায়নামাজে সামিল হবেন। কিন্তু সহসা অলৌকিক এক আওয়াজে মুসল্লীগণ

হতবিহবল হয়ে বাইরে তাকালে অপূর্ব এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যাবে। দু'টি হলুদ বর্ণের সুন্দর কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন আগন্তুকের বাহুতে ভর করে ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে অবতরণ করবেন যিনি, তিনিই হজরত ঈসা মসীহ আ.। বলা বাহুল্য আগন্তুকদ্বয় দু'জন ফেরেশতা। ফেরেশতাদ্বয় হজরত ঈসা মসীহ আ. কে পূর্ব দিকের মিনারের উপর রেখে চলে যাবেন।

কৌতূহলী জনতা এগিয়ে গিয়ে মইয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং ঈসা মসীহ আ. কে আঙিনায় নামিয়ে নেবেন। অতঃপর নামাজের কাতারে দাঁড়িয়ে যাবেন মসীহ ঈসা আ.।

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আ. হজরত ঈসা মসীহ আ. এর সম্মানার্থে ইমামতির জায়নামাজ থেকে পেছনে সরে আসলে হজরত ঈসা মসীহ আ. বলবেনঃ "এই ইকামত তোমার জন্যেই বলা হয়েছে। অতএব তুমিই নামাজ পড়াও"।

নামাজ অন্তে মুসলিম নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই হজরত ঈসা মসীহ আ. এর তালুবন্দী হবে। তিনি বর্শা নিয়ে ছুটবেন দাজ্জালকে হত্যা করার জন্যে। পথিমধ্যে শহরতলীর বাইরে 'লুদ' এর দ্বার প্রান্তে দাজ্জালকে পেয়ে গেলে, দাজ্জাল তাঁকে দেখে ভয়ে শীসার ন্যায় গলে যেতে থাকবে।

হজরত ঈসা মসীহ আ. অগ্রসর হয়ে পথভ্রষ্ট মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। দাজ্জালের মৃত্যুর সাথে সাথেই যবনিকাপাত ঘটবে এক গাঢ় অন্ধকার পর্দার।

খৃস্টানরা সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলে মুশরিকদের উপরও তার প্রভাব পড়বে। ফলতঃ তারাও গ্রহণ করবে দ্বীন-ই-ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে তখন অন্য কোনো ধর্মের লেশমাত্র থাকবে না।

এই ঘটনা সংঘটিত হবার কিছুকাল পর দেখা দেবে আরেকটি ফেৎনা। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ইয়াজুজ মাজুজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এই ফেৎনারও মূল উৎপাটন করবেন আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে হজরত মসীহ ঈসা আ.। মুসলমানরা নিরাপদ বোধ করতে থাকবে এরপর।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল জনগণের মধ্যে ন্যায় ইনসাফভিত্তিক শরীয়ত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলবেন তিনি।

"লা-রূহবানিয়া ফিল ইসলাম"-ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে স্বীকার করে না। তিনি চল্লিশ বছরের মধ্যে মহানবী হজরত মোহাম্মদ স. এর সুন্নত অনুসারে বৈবাহিক জীবন যাপন করবেন। শুধু তাই নয়, জন মানুষে কল্যাণকর, প্রাচুর্যময় জীবন প্রবাহ গড়ে তুলবেন তিনি।

ভয়াবহ কিয়ামতের দিনেও মসীহ ঈসা আ. সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান হবেন। যখন আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্ন করবেনঃ হে ঈসা! আপনি কি বলেছিলেন— আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাকে ইলাহ বানিয়ে নাও?

তিনি বিনীত জবাব দেবেনঃ " হে মহান আল্লাহ্! এমন ধরনের কোনো কথা বলার কোনো অধিকার আমাকে প্রদান করা হয়নি.....এরূপ যদি বলেই থাকতাম, নিশ্চয় আপনি তা জানতেন..... নিশ্চয় আপনি জানেন আমার মনে কি আছে....অথচ আমি জানি না আপনার কোনো গোপন তত্ত্ব"... (সূরা মায়েদা ১১৬-১১৮)।

তিনি আরো বলবেনঃ " হে মহান প্রতিপালক আমি তাদেরকে বলেছি .... তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করো, তিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু....(কাসাসুল কুরআন)

তখন অবিশ্বাসীদের যে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা হবে, তারও চিত্র পবিত্র আল কুরআনে চিত্রিত হয়েছে।...."হায়! তুমি যদি দেখতে পেতে-যখন তারা (সত্য অমান্যকারীরা) কি ভীষণ ভীতসন্ত্রস্ত হবে..... কিন্তু পালাবার কোন পথ পাবে না বরং তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে এবং তখন তারা বলবে..... আমরা এখন তার (ঈসার) প্রতি ইমান আনলাম"।

"দাফেউল বালা' নামক এক গ্রন্থে একজন ভণ্ড-কাজ্জাব নিজেকে মসীহ মাওউদ (প্রত্যাশিত মসীহ) হিসেবে দাবী করেছিলো। সে বলেছেঃ "খোদাতায়ালা এই উম্মতের মধ্য থেকে মসীহ মাওউদকে প্রেরণ করেছেন, যে পূর্বতন মসীহ ঈসা থেকে সর্বদিক থেকেই অগ্রগামী এবং তিনি এই মসীহর নাম রেখেছেন— গোলাম আহমদ'। (পৃষ্ঠা-১৩, প্রকাশ ১৯০২)

মহানবী হজরত মোহাম্মদ স. এহেন মিথ্যাবাদী কাজ্জাবদের সম্পর্কে সতর্ক উচ্চারণ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "কক্ষণো কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত ত্রিশজনের মতো কাজ্জাব জন্মগ্রহণ না করবে। তাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, তারা আল্লাহ্র রসুল"।

কাজ্জাব মুসায়লামা, আসওয়াদে আনাসী, তুলায়হা হারীছ, কাদীয়ানী গোলাম আহমদ, মার্ক হ্যানা, হারান আমব্রী..... এদের রক্তে মেরু মজ্জায়, নিঃশ্বাসে, বিশ্বাসে মিশে আছে বিভ্রান্তি; সত্য হননের নেশা...

অতএব শুনহে সুজন!

'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃয়মান।'

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সত্যিই তিনি আসবেন। আবার আসবেন।

ISBN 984-70240-0041-5

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া